চরমোনায়ের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন

মাসুদা সুলতানা রুমী

চরমোনায়ের পীর সাহেব
আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশনী

www.amarboi.org

চরমোনায়ের পীর সাহেব আমাকে
জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
তৌহিদুর রহমান
বদ্বীপ প্রকাশন
৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেট,
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-০১৯৩৭০৩০৪৪৮
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৬
পঞ্চম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ
গোলাম সাকলায়েন
মূদ্রক
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

ISBN-984-817-012-X

www.amarboi.org

কি করে এ পথে এলেন? প্রায়ই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট পাই এই প্রশ্ন শুনে। হায়! আফসোস! এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে জিজ্ঞেস করছে কি করে খাঁটি মুসলমান হলাম? অথচ আমরা কেউ নও মুসলিম নই। সবাই বংশানুক্রমে মুসলমান।

অবশ্য জিজ্ঞেস করার পেছনে কারণ আছে। কারণ মুসলিম শব্দটা এখন কুয়াশাবৃত। কে কেমন মুসলমান এটা বুঝতে হলে এখন তিনটি শব্দ প্রয়োগ করতে হয়।

১. সাধারণ মুসলমান ২. আল্লাহওয়ালা মুসলমান। আর- ৩. মৌলবাদী মুসলমান।

১. সাধারণ মুসলমান তারা যারা সময় পেলে মাঝে মাঝে দু'চার ওয়াক্ত নামায পড়ে। রমযানের রোযাও রাখে। বিয়ে, খাতনা, আকীকা, জানাযা মুসলমানী পদ্ধতিতে করে। দান খয়রাতও করে। আবার বিনা প্রয়োজনে নামায রোযা ছেড়েও দেয়। অবশ্য ইসলামের অন্যতম ফরয পর্দা পালন করে না। মহাজাকজমকের সাথে কুলখানি, মিলাদ মাহফিল, নফল ইবাদাত, বিশেষ করে শবে বরাত ও ঈদ উদ্‌যাপন করে এবং আমরা ধর্মান্ধ নই বলে গৌরব করে। এরা রাজনৈতিকভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। এরাই আমাদের সমাজে সাধারণ মুসলমান নামে পরিচিত।

২. আল্লাহওয়ালা নামে পরিচিত তারা যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, নফল ইবাদাতসমূহ আদায় করে, রমযানের ফরয রোযার পর অন্যান্য নফল রোযাও রাখে, মোটামুটিভাবে পর্দা করে, জিকির আজকার ও তসবিহ-তাহলিলও করে। লম্বা আজানুলম্বিত জামা পরে। তবে এরা আধুনিক শিক্ষাকে ঘৃণার চোখে দেখে। রাজনীতি ও সামাজিক কাজগুলোকে ঝক্কি-ঝামেলা ও ফেতনা-ফাসাদ মনে করে। এরা কারো সাথে তেমন একটা মিশতে চায় না। কারো সাতে-পাঁচে এরা নেই। অবশ্য কেউ চাইলে পানি পড়া, তেল পড়া ও ঝাড়-ফুঁক করে থাকে। এরা অনেক ক্ষেত্রে সমাজে সম্মানের পাত্র। এরাই সমাজে আল্লাহওয়ালা নামে পরিচিত।

৩. তৃতীয় দলটা হচ্ছে মৌলবাদী। এরা সব ধরনের ফরয, ওয়াজিব এবং প্রয়োজনীয় নফল ইবাদাত বন্দেগীর সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন কায়েম করার কাজে তৎপর। শুধু ঢিলা-কুলুপ আর মিষ্টি খাওয়া সুন্নত নিয়েই এরা ব্যস্ত থাকে না। এরা রসূল স.-এর বিপ্লবী জীবনকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে চায়। সমস্ত বাধা- বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এরা সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় সকল প্রকার বিদআতী ও শিরকী কার্যক্রম। কায়েম করতে চায় পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আইন। এরা শুধু নামায আর যাকাত আদায় করেই তৃপ্তি পায় না। এরা নামায ও যাকাতকে সমাজে কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শুধু নেকির আশায় কুরআন তেলাওয়াত করে না আর চুমু খেয়ে তাকের ওপর তুলেও রাখে না। এরা কুরআনকে দেখতে চায় সংবিধানরূপে। কুরআনের আইন দেখতে চায় সমাজের সর্বত্রই— মসজিদ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত।

www.amarboi.org

তাই সমাজের কায়েমী শক্তি এদের শত্রু। সাধারণ মুসলমান এমন কি আল্লাহওয়ালা নামে পরিচিত কিছু মুসলমানও এদের সংগে শত্রুতা করতে পিছপা হয় না। কারণ ইসলাম কি এবং কাকে বলে এর সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান বিশ্বের বারো আনা মুসলমানের নেই। এই শেষোক্ত দলটির সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মের মতো ইসলাম যে কেবল আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্ম নয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ বিপ্লবী মতাদর্শের নাম। যে মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে পাওয়া যাবে খোলাফায়ে রাশেদার মতো একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ। এই দলটি এ কথা বিশ্ববাসীকে বুঝাতে চাচ্ছে সর্বক্ষণ।

আর এতে আঘাত লাগছে যাদের স্বার্থে তারাই ঠাট্টা বিদ্রূপ আর গালাগালির ভাষায় এদের নাম দিয়েছে মৌলবাদী। কিন্তু এই নামকরণে এরা অসন্তুষ্ট তো নয়ই বরং খুশি। যেমন আমি নিজেকে মৌলবাদী ভাবতে গর্ববোধ করি। ধন্য মনে করি নিজেকে এই দলের একজন সামান্য কর্মী হতে পেরে।

তাই যারা প্রশ্ন করেন কি করে এ পথে এলেন? তারা জানতে চান না কি করে আমি একজন খাঁটি মুসলমান হলাম। তারা জানতে চান কি করে মৌলবাদী হলাম? আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, কি করে জামায়াতে ইসলামীতে এলাম?

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার রুকনিয়াতের শপথ হয়। রুকনিয়াতের প্রশ্ন পত্রে উল্লেখিত ছিল কিভাবে জামায়াতে ইসলামীতে এলেন? আমার প্রশ্নের উত্তরটি ১৯৯০ সালের খুব সম্ভব জানুয়ারীর কোনো এক সংখ্যায় সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও লেখাটি আমি পত্রিকায় দিইনি কর্তৃপক্ষই দিয়েছিলেন। তবে আমার লেখাটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তখন থেকেই একটা ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম, কিভাবে জামায়াতে এলাম তা একটু বিস্তারিতভাবে লিখবো। কিন্তু সময় সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

ইদানিং আমার শ্রদ্ধেয় ভাই কবি আব্দুল হালীম খাঁ সাহেব বার বার তাগিদ দিচ্ছিলেন বিষয়টি লেখার জন্য। আর তাছাড়া বয়স হয়েছে কখন পরপারের ডাক এসে যাবে, হয়তো চলে যাবো কেউ জানবেই না কেমন করে একটা বৈরী পরিবেশ থেকে মহান আল্লাহ আমাকে বের করে এনে এই বিপ্লবী কাফেলার মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন। আমি তো হঠাৎ করে আসিনি কিংবা সিস্টেম অনুয়ায়ী জামায়াত আমাকে টার্গেটও নেয়নি। আর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার মতো তেমন পরিবেশও আমাদের পরিবারে ছিল না। তাই বলি 'মহান আল্লাহ এনেছেন, তাই এসেছি'।

আমরা একটা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পরিবার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তখন প্রায় প্রতিরাতেই ১০/১২ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও সেবা-যত্নের জন্য অবস্থান করতেন। সেসময় আম্মাকে সাহায্য করেছি রাত জেগে। দিনের বেলা গভীর দায়িত্ব অনুভূতি নিয়ে গোপন করেছি রাতের

www.amarboi.org

কর্মকাণ্ড। মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধা কাকুরা বলতেন, 'আমরা যে তোমাদের বাসায় আসি তা যেনো কাউকে বলে দিও না'।

আমি অবাক হতাম। মনে মনে বলতাম, পাগল নাকি, এরা বলে কি? আমি কি এতোই ছোট? এতোই অবুঝ? না, আমি মোটেও ছোট ছিলাম না। যদিও বয়স ছিল মাত্র এগার বছর।

আব্বা এবং মুক্তিযোদ্ধা কাকুরা যা কিছু আলোচনা করতেন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। তাদের আলোচনা সমালোচনা শুনে ধীরে ধীরে জামায়াতে ইসলামী বিরোধী মনোভাব নিয়েই বড় হয়ে উঠলাম। তাই বলে ইসলাম বিরোধী হয়ে নয়। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ধারণা হলো এই যে, এরা একটি রাজনৈতিক দল। এরা মুখে ইসলামের কথা বলে কিন্তু কার্যত ইসলাম বিরোধী কাজ করে। আর অধ্যাপক গোলাম আযম তো এদেশের সব চেয়ে নিকৃষ্ট একটা মানুষ।

পক্ষান্তরে আর একটি ব্যক্তিত্ব আমার কিশোরী মনের সিংহাসনে শ্রদ্ধা ভক্তির পূর্ণ প্রতীক হয়ে জেঁকে বসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে যখন সুরেলা কণ্ঠে গাইতাম 'তুমি বাংলার চির সম্রাট/অন্ধকারের শশীরে মুজিব---'। তখন মনের আবেগে চোখে পানি এসে যেতো।

শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলেন, তখন আমার মা এবং দাদী শোকরানা রোযা রেখেছিলেন। তাকে ভালোবেসে ছিলাম হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে।

আমাদের বাসার কাজের বুয়া কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিল, 'আগে ভালোই ছিলাম গো আম্মা। এই মজিবরই তো দেশটারে খাইলো।' তার কথা শুনে আমি রাগে দুঃখে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলাম। তখনই আম্মাকে ডেকে বললাম, 'আম্মা এই বেয়াদব মহিলাকে বাসায় রাখা যাবে না।'

মহিলা তো অবাক। 'কেন গো আম্মা আমি কি দোষ করলাম?'

'চুপ কর! তোমার মত মানুষের মুখে ঐ নামটাও শুনতে চাই না। তুমি এইভাবে নামটা উচ্চারণ করলে কেন?' আমি কি বলবো যেনো কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

মহিলা আবার বললো 'কেন গো আম্মা তার নাম তো মজিবর। মজিবরকে মজিবর বলবো নাতো কি বলবো?'

আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে উঠলাম, 'চুপ বেয়াদব মহিলা। 'বঙ্গবন্ধু বলবে, শেখ সাহেব বলবে।'

মহিলাকে শেষ পর্যন্ত বিদায়ই করে দিলাম। আম্মা অবশ্য বললেন, গরুকে খাওয়ানো, পানি তোলা, থালা-বাসন মাজা-ধোয়া করা এগুলো কে করে দেবে বুয়া না থাকলে?

আমি বলেছিলাম, আম্মা যতদিন ভালো কাজের বুয়া না পাওয়া যায় ততদিন আমিই সব কাজ করে দেবো। মহিলার বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তায় আম্মাও অসন্তুষ্ট ছিলেন। শেখ মুজিবকে কতো যে ভালোবেসেছিলাম তা বলে বুঝাতে পারবো না।

www.amarboi.org

আমাদের পরিবারে নামায রোযা ছিল। আব্বা-আম্মা, দাদা-দাদী পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দ ছিলেন। আমরা ছোটরাও সময় সুযোগ মতো নামায পড়তাম। কিন্তু পর্দার ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম।

ঘরোয়া পর্দা মানে গায়ের মাহরম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পর্দাতো ছিলই না বাইরের পর্দাটাও ছিল এ রকম, আম্মা যখন আমার দাদা বাড়ি থেকে আমার নানা বাড়ি যেতেন তখন বোরকা পরতেন।

দাদা বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল বাসে যাওয়ার পর নৌকায় যেতে হতো। এরপর নৌকা থেকে নেমে মাইল খানেক হেঁটে মামার বাড়ি যেতে হতো। তো আম্মা ঐ নৌকা থেকে নেমে আর বোরকা পরতেন না। কারণ, এটা ছিল আম্মার বাপের বাড়ির এলাকা। আবার ফিরে আসার সময় এর বিপরীত করতেন। নৌকা থেকে নামার পূর্ব মুহূর্তে বোরকা পরতেন। কারণ তখন শুরু হয়ে যেতো আম্মার শ্বশুর বাড়ির এলাকা।

আমি ভাবতাম বোরকা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পোশাক। আমি আমার ফুফু আম্মাকেও এমনি দেখেছি। ইসলামের ওপর মহব্বত ছিল কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমরা। ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলো সবাই পালন করার চেষ্টা করতেন। নফল রোযা, নফল নামায, শবে বরাত, শবে মিরাজ, শবে কদর খুব জাঁকজমকের সাথে পালন করতাম। নফল ও ফরযের পার্থক্য কমই বুঝতাম। তার মানে আমাদের সমাজের অন্য দশটা ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম পরিবার যেমন ঠিক তেমনি একটি পরিবারেই আমি জন্ম নিয়েছি। শৈশব কৈশোর পার করে বাইশ বছর বয়সে আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন আসে। এর আগের কিছু ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে ভাবিত করে তোলে।

১৯৭৩ সাল। ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ। অন্তরটা দেশ প্রেমে ভরপুর। মাদারীপুর জেলার (তখন অবশ্য ফরিদপুর জেলা) রাজৈর গার্লস হাইস্কুলে পড়ি। প্রচণ্ড ভক্তি আর ভালোবাসার সংগে উদ্‌যাপিত হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী আর স্বরস্বতী পূজা। প্রতি বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। খুব আনন্দদায়ক ছিল আমাদের স্কুলের পরিবেশটা। দশজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন আমাদের। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে স্যারকে আমার ভালো লাগতো তিনি আমাদের ইংরেজি স্যার নিত্য গোপাল হালদার। এতো সুন্দর করে পড়াতেন মাঝে মাঝে তিনি গল্প বলতেন। তাঁর কথা তন্ময় হয়ে শুনতাম আমরা। একদিন স্যার ক্লাসে আসলেন, আমরা উঠে দাঁড়ালাম। গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। ইংরেজি বইটা এগিয়ে দিলাম স্যারের কাছে। স্যার বইটা হাতে নিলেন কিন্তু দৃষ্টি আমাদের দিকে। আমাদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর বইটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললেন, আজ তোমাদের ইংরেজি পড়াবো না। তোমরা সবাই খাতা খোল-লেখ। খাতা খুলে কলম হাতে নিয়ে বললাম কি লিখবো স্যার? স্যার কি যেনো ভাবলেন তারপর বললেন, 'লিখবে তোমাদের জীবনের লক্ষ্য, বইতে যা লেখা আছে তা নয়, যার যা উদ্দেশ্য তাই লিখবে।' আমরা ছাত্রীরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলাম। স্যার

www.amarboi.org

একটু হাসলেন। খুব সুন্দর করে হাসতে পারতেন স্যার। বললেন, 'তোমাদের তিন মিনিট সময় দিলাম চিন্তা করার জন্য। পনের মিনিট সময় পাবে লেখার জন্য। সংক্ষেপে মূল কথাটা লিখবে।' বেশ মজার ব্যাপার! পরস্পর হাসি বিনিময় করে লেখা শুরু করলাম। বারো জন ছাত্রী। যার যা উদ্দেশ্য লিখলাম। খাতা জমা হলো স্যারের কাছে। গভীর মনোযোগ নিয়ে স্যার খাতা দেখছেন। কেউ লিখেছে ডাক্তার হবে, কেউ লিখেছে মাস্টার হবে। সবিতা আর জোৎস্না লিখেছে সুগৃহিনী হবে। স্যার পড়ছিলেন আর আমরা আনন্দ উপভোগ করছিলাম। দুটো খাতায় স্যার চোখ বুলালেন। জোরে পড়লেন না। ভ্রুদুটো যেনো একটু কুচকে গেল। আবার স্বাভাবিক হয়ে খাতা দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। একটা আমার আর একটা ফাস্ট গার্ল মমতাজের।

'ওরা কি লিখেছে স্যার, কি লিখেছে?' সবাই সমস্বরে জানতে চাইল। স্যারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।' পরে শুন। সবার খাতা পড়া হয়ে গেল। এবার এই খাতা দুটো হাতে নিলেন স্যার। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন. তোমরা দু'জন কি একই বাড়ির মেয়ে?

'না স্যার, আমাদের গ্রামও ভিন্ন।' বললাম আমি। স্যার আবার বললেন, তোমরা দু'জন কি আত্মীয়? না স্যার। উত্তর দিল মমতাজ। স্যার হাসলেন, বললেন 'তাহলে তোমাদের দু'জনের একই উদ্দেশ্য হয় কি করে?'

আমি তাকালাম মমতাজের দিকে। মমতাজ আমার দিকে। মমতাজ বরাবরই একটু লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে যেনো লজ্জাই পেল।

কে একজন বললো, স্যার ওরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্যার যেনো একটা সূত্র খুঁজে পেলেন, বললেন, হ্যাঁ এটা একটা বড় কারণ। দু'জনের চিন্তা ধারায় মিল আছে বলেই ওদের বন্ধুত্ব। যদিও চিন্তা ধারাটা ভুল।

চমকে উঠলাম।

কি লিখেছে বলেন না স্যার। সবিতার অনুরোধ। সবাইকে উদ্দেশ্য করে স্যার বললেন, এদের দু'জনের উদ্দেশ্য যদিও এক তবে ভাব প্রকাশের ভাষা একটু আলাদা। এরা দুজনেই বড় হয়ে ধর্ম প্রচারিকা হতে চায়। সবার মুখেই একটু কৌতুকের হাসি। স্যারের ঠোঁটেও। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা মাসুদা বলতো ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ?

যতদূর মনে পড়ে আমার খাতায় আমি লিখেছিলাম, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। শুধু পরিচয় দেবার সময় বলি আমি মুসলমান কিংবা আমি হিন্দু। আমি বড় হয়ে আমার ধর্মকে ভালোভাবে জানবো তারপর এর প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবো।

আমি এখনও মাঝে মাঝে অবাক হই। কেন ওকথা লিখেছিলাম? আমার পরিবার যে খুব একটা ধার্মিক পরিবার ছিল তাও নয়। আমার আম্মা এবং ফুফু আম্মাকে দেখেছি আগে মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বাইরে কোথাও যেতে হলে বোরকা পরতেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বোরকা ছেড়ে দিলেন। তখন আমার বয়স ১৩/১৪ বছর।

আমি চুপ করে ছিলাম। স্যারই আবার বললেন, 'ধর্ম শব্দের অর্থ যা কিছু ভালো তাকে ধারণ করা। কোনো কাজকে হিন্দু ধর্মে বলা হয় ভালো, আবার সেই কাজকেই ইসলাম

www.amarboi.org

ধর্মে বলা হয় খারাপ। আবার দেখবে ইসলাম ধর্মে যে কাজটাকে ভালো বলা হচ্ছে সেই কাজটাই হয়তো হিন্দু ধর্মে জঘন্য খারাপ। গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব হিন্দু কিংবা মুসলিম কোনো ধর্মের নাম নয় আর এটা কোনো পরিচয়ও নয়। তোমার পরিচয় তুমি মানুষ। মানবতাই তোমার ধর্ম।'

'স্যার'! মমতাজের কণ্ঠস্বর। তাহলে কুরআন হাদীসে যে পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কারের কথা লেখা আছে তা কি সবই মিথ্যা? 'হ্যাঁ-মিথ্যা'। স্যারের স্পষ্ট উক্তি। 'অন্যায় করলে তোমার মাঝে যে অনুশোচনা জাগে এটাই শাস্তি। আর ভালো কাজ করলে মনে যে তৃপ্তি আসে ওটাই পুরস্কার।'

ঃ ন্যা স্যার, দৃঢ়তার সাথে বললো মমতাজ। আদম আ. থেকে এই পর্যন্ত যতো মানুষ মারা গেছে এবং যতো মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত মারা যাবে প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কাজের হিসেব নেয়া হবে। আর সেই অনুযায়ী তাদের বেহেশত কিংবা দোযখে স্থান দেয়া হবে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম মমতাজের মুখের দিকে, কি সুন্দর গুছিয়ে কথা বললো মমতাজ। স্যার বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, তোমরা বলতে চাও যতো মানুষ মরেছে সব আত্মাগুলো তোমাদের আল্লাহ হাতে নিয়ে বসে আছেন বিচার করার জন্য?

আমার ভিতরটা কেমন যেনো মুচড়ে উঠলো। বললাম। স্যার যা জানেন না, বোঝেন না সে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। আপনি কি করে এসব জানবেন? আমার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না দেখলাম ক্লাসের সব মেয়েরা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মমতাজ একটু ভীত স্বরেই বললো, এই রুমী কি হচ্ছে? বোস। আমি বসলাম না ভিতরে যেনো আগুন ধরে গেছে আমার। আবার বললাম। আপনি ইংরেজির মাস্টার ইংরেজি পড়াবেন আর কোনো দিন এসব বিষয়ে নিয়ে কথা বলবেন না।

স্যার একটু রেগে উঠলেন, চুপ বেয়াদব মেয়ে। স্যার, বেয়াদব আমি না, আপনি? যে মাস্টার তাঁর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এমন বেয়াদবের মতো কথা বলতে পারে তার ছাত্রী আবার কেমন আদব সম্পন্ন হবে স্যার? রাগে আমার বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল যেনো। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বইগুলো হাতে নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে চলে এলাম, আমার খাতাটা স্যারের সামনেই পড়ে থাকলো।

পরের দিন স্কুলে যেতে খুবই ভয় লাগছিল। হেড মিস্ট্রেস বড় আপা ভীষণ রাগী। আমার এই ক্লাস থেকে বের হয়ে যাওয়া তার কানে গেলে আর রক্ষা নেই।

দু'বার বড় আপার সাথে দেখা হলো। কিছুই বললেন না তিনি। বুঝলাম তার কানে কথাটা যায়নি। যথারীতি শেষ পিরিয়ডে নিত্য গোপাল স্যার আসলেন। স্যারের দিকে তাকালাম না। বুঝা যাচ্ছে স্যার রাগ করেননি। ঠোঁটে সেই মিষ্টি হাসিটা লেগেই আছে। আমাকে ডেকে বললেন, এই মেয়ে রাগটা একটু কমানোর চেষ্টা করিস। এতো রাগ থাকলে তো শ্বশুর বাড়ির ভাত খেতে পারবি না। শ্বশুরের সাথে মতে না মিললে তো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, তখন কেমন হবে? মেয়েরা সবাই হেসে উঠলো। আমি হেসে ছিলাম কিনা মনে নেই।

www.amarboi.org

তারপর বহুদিন পার হয়ে গেছে। আমার সেই কৈশোরের উদ্দেশ্যের কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। অথচ আমার প্রভু আমার সেই কিশোরী মনের অভিলাসকে কবুল করে নিয়েছেন। তাই তো আমি আজও টিকে আছি আমার সেই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে।

জানিনা কোথায় আছে আমার সেই স্যার, কমরেড নিত্যা গোপাল হালদার।

জানিনা মমতাজ তার উদ্দেশ্যকে কতোখানি সফল করেছে।

আমার আম্মার মামা শাহাবুদ্দীন মাস্টার একটু পাগলাটে ধরনের লোক ছিলেন। ভদ্রলোক বি.এ. পাস এবং হাই স্কুলের মাস্টার ছিলেন। তাকে সবাই অংকের জাহাজ বলতো। অবশ্য কারো কাছে তেমন একটা মান সম্মান পাননি কোনো দিন। সামনে কেউ কিছু না বললেও আড়ালে সবাই তাকে গাগলা বলেই ডাকতো। অস্বাভাবিক ধুমপান করতেন। ইসলামী নিয়ম নীতি তেমন একটা মানতেন না, কিন্তু মুসলিম লীগ করতেন। অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন। তাই তার এলাকায় যুদ্ধের সময় কেউ কোনো লুটপাট করতে পারেনি। অনেক হিন্দুরা রাতের আঁধারে তার বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে এসেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার তারা যথাসম্ভব সবকিছু ফেরত পেয়েছে। তিনি কারো কোনো ক্ষতি করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে তাকে বেশ মারধর করে জেলে পাঠানো হয়।

এক মুক্তিযোদ্ধা রাইফেলের বাট দিয়ে মাস্টার সাহেবের মাথায় আঘাত করেছিল। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে এবং সাথে সাথেই তিনি বেহুশ হয়ে যান। অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা। তখন পুলিশ তাকে উদ্ধার করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। তার তেমন কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। বিয়ে শাদীও করেননি। বয়স তখন ৩৫। শুধু আম্মা মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করতেন, ঐ পর্যন্তই। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মনটা এই প্রথম খারাপ হলো। মুক্তিযোদ্ধা যে ছেলেটা মেরেছিল সে ছিল নানার ছাত্র। আমার আম্মা বলেছিল 'মামা আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। মুক্তিযোদ্ধারা.....।'

আম্মার কথা শেষ করতে না দিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। উপকারই করেছি। আমাকে মারবে কেন?'

তার নামে কোনো কেস ছিল না। বিনা অপরাধে তিন বছর জেল খেটে নানা যখন জেল থেকে আসলেন তখন তার মধ্যে দেখলাম আমূল পরিবর্তন। সিগারেট ছেড়ে পান ধরেছেন। মাত্রাটা অবশ্য ঠিকই আছে। এক ওয়াক্ত নামায কাযা করেন না। মাঝে মাঝে রাতে আমাদের বাড়ি থাকতেন। তখন দেখতাম অনেক রাত পর্যন্ত কুরআন হাদীস পড়তেন। আবার তা লিখেও রাখতেন। আমরা ঠাট্টা করতাম, 'জেলে গিয়ে নানা মুসল্লি হয়ে গেছে।' এখন বুঝতে পারছি জেলখানা থেকে নানা সঠিক ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে এসএসসি পাস করার পর যশোর এলাম আব্বার চাকরিস্থলে। ভর্তি হলাম যশোর সিটি কলেজে। যেনো এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করলাম। পুকুরের মাছ

www.amarboi.org

যেনো বিশাল নদীতে এসে পড়লো। প্রতিদিনের প্রতিটি কথা আব্বাকে বলতাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আব্বা ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের ওপর অসাধারণ দখল ছিল তার। আব্বা যখন ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা বলতেন– রসূল স. থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদা, উমাইয়া শাসন, আব্বাসীয় আমল, স্পেনের মুসলমান, ফার্দিন্যান্ড-ইসাবেলার আক্রমণ, মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন, জেরুসালেমে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর বিজয়, চেংগীস খানের ধ্বংসযজ্ঞ, ভারতের মুসলিম বিজেতা মুহাম্মদ বিন কাসিম, মোঘল সাম্রাজ্য, আকবরের ইসলাম বিদ্বেষ, জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব, ইংরেজদের আগমন, স্বদেশী আন্দোলন। কতো যে কাহিনী।

তখন মনে হতো আব্বা বুঝি সব দেখে এসেছেন। এভাবে ধীরে ধীরে আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল ইতিহাস প্রীতি, ইসলাম প্রীতি, মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও ঐতিহ্যের কথা। মুসলিম নারীদের সাহসিকতা ও ঈমানের দৃঢ়তার কথা যখন আব্বা বর্ণনা করতেন তখন মনে হতো আমি তাদেরই একজন। মাঝে মাঝে আফসোস হতো হায় যদি আমার জন্ম হতো সেই জামানায়।

কিন্তু এ পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমি তখনও পাইনি। মনটা যতখানি ইসলামপন্থী ছিল বাহ্যিক আচরণে তা মোটেও প্রকাশ পেত না।

ছোটবেলা থেকেই ভালো গান গাইতে পারতাম, যে কোনো সুর একবার শুনলেই অবিকল সেভাবে গাইতে পারতাম। যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। কলেজে ভর্তি হয়ে অনেকের সাথে পরিচয় হলো। কল্পনা নামে এক মেয়ের সাথে খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। সে 'যশোর মাইকেল সঙ্গীত একাডেমীর' ছাত্রী ছিল। ওর পরামর্শেই হারমনিয়াম কেনার জন্য জিদ ধরলাম। আব্বা প্রথমে রাজী ছিলেন না। পরে আমার জিদের কাছে হার মানলেন। হারমনিয়াম কিনে দিলেন। মাইকেল সঙ্গীত একাডেমীতে ভর্তি হলাম। খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্বে এসে গেল বিভিন্ন কলা-কৌশল। ওস্তাদ হরিপদ দে খুব প্রশংসা করতেন আমার। আমাকে বাদ দিয়ে কলেজের কোনো ফাংশনই হতো না। এসব করার পরও নিজেকে একজন খাঁটি মুসলিম মনে করতাম। তবে অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ কখনও পরিনি। কোনো দিন সাজ-সজ্জা করে কলেজে যাইনি। একবার সব বান্ধবীরা মিলে ছবি তুলবো বলে শাড়ী পরে কলেজে গিয়েছিলাম। অনার্স থার্ড ইয়ারের এক বড় ভাই সামনে এসে বললো, শাড়ী পরে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, এর পর থেকে শাড়ী পরে আসবে। কেমন যেনো একটু হকচকিয়ে গেলাম। রাগ করে বললাম, কে কি পোশাক পরে আসে তাই দেখার জন্যই বুঝি কলেজে আসেন? বড় ভাইটি মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি বলি তাই'। এখনো মনে আছে বলেছিলাম, সিটি কলেজে আর কয়টা মেয়ে! তাহলে আপনি কোনো সিনেমা হল কিংবা পার্কের গেটে গিয়ে দাঁড়ান। অনেক রং বেরঙের পোশাক পরা মেয়ে দেখতে পাবেন।

পরামর্শ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, বলে হাসতে হাসতে চলে গেল ছেলেটি। আমি বাড়ি এসে আব্বার কাছে নালিশ করাতে আব্বা বললেন, শাড়ী পরে গিয়েছ তাই বলেছে। খারাপ তো কিছু বলেনি। এতে রাগ করার কি আছে। এই সামান্য ব্যাপারে অসহিষ্ণু হতে হয় না।

www.amarboi.org

নামায পাঁচ ওয়াক্তই পড়তাম, মাঝে মাঝে কুরআন তেলাওয়াত করতাম। হাফেজ দিয়ে শুদ্ধ করে কুরআন পড়া শিখিয়েছিলেন আব্বা। পর্দা সম্পর্কে ধারণা ছিল এতোটুকু, শালীনতা বজায় রাখাটাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত করাটা বাড়াবাড়ি।

গানের প্রতি ঝোঁকটা খুবই বেড়ে গেল। ভবিষ্যতে নিজেকে দেখতে চাইলাম একজন সংগীত শিল্পী হিসেবে। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। বিকাশ চক্রবর্তী নামে এক ক্লাসমেট ছিল। শিল্পী পরিবার। ওর মাও খুব সুন্দর গান গাইতে পারতো। একদিন আমাদের স্কুল ফাংশনে বিকাশ তবলা বাজালো আর ওর মা হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলো। সেই দৃশ্যটা আমার কি যে ভালো লেগেছিল। সেই শিশু বয়সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি গান গাইবো আর আমার ছেলে তবলা বাজাবে। সংগীত একাডেমীতে ভর্তি হয়ে সেই স্বপ্ন আবার দেখতে লাগলাম।

এতদিনে আমার মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে কিশোরী বয়সের সেই জীবনের লক্ষ্য 'ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানবো-মানবো এবং প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।'

১৯৭৯ সালে বিয়ে হয়ে গেল সাবসিডারী চূড়ান্ত পরীক্ষার আগেই। আমারই মতো নামকাওয়াস্তে এক মুসলমানের সাথে। তিনিও নামায রোযা করেন। ভালো গান গাইতে পারেন আর তার চেয়েও ভালো পারেন বাঁশী বাজাতে। অপূর্ব সুর তার বাঁশীতে।

আমার সপ্রতিভ চলা ফেরা, দ্বিধা সংকোচহীন কথা-বার্তা তদুপরি আমার কণ্ঠস্বর এবং গানের জন্যই নাকি তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তা না হলে তার মতো অমন সুশ্রী সুন্দর .....। যাহোক, এক বছরের মধ্যেই আমি পুত্র সন্তানের মা হলাম। যখন আমি বুঝলাম, যে মা হতে যাচ্ছি তখন থেকেই আমার মানসিক পরিবর্তন হতে লাগলো। বিশেষ করে এই সময় আমার দাদী আমাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে লাগলেন, সন্তান গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মা যে ধরনের আচরণ বা চিন্তা ভাবনা করে সন্তান তেমনি হয়। সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দিলাম। সাইকেল চালানো ছেড়েছি আরও আগে। শরৎ সাহিত্য আর রবীন্দ্র সাহিত্যের ভক্ত ছিলাম। তাও ছেড়ে দিয়ে পড়তে লাগলাম বিশ্বনবী। বই পড়ার অভ্যাসটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আব্বার কাছ থেকে। কখনও আব্বা পড়তেন আমি শুনতাম আবার কখনও আমি পড়তাম আব্বা শুনতেন। অনেক রাত জেগে পড়তাম আমরা। এর জন্য আম্মার কাছে কতো বকা খেয়েছি আমি আর আব্বা।

গান, ফাংশন, সভা, সমিতি সব ছেড়ে দিলাম। একান্ত দায়ে না পড়লে বাইরেই বের হতাম না। মাঝে মাঝে আমার স্বামী ঠাট্টা করে বলতেন, কি ব্যাপার দিন দিন যেনো বড়পীর সাহেবের মা হয়ে যাচ্ছ। ইতিমধ্যে আব্বা আমাকে একটা বই এনে দিলেন, আমার জীবনের ভালোলাগা উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই উপন্যাসটি ছিল নসীম হিজাযীর 'শেষ প্রান্তর'। কয়েক বার পড়লাম বইটা। প্রেমের এমন অনবদ্য কাহিনী আমি জীবনেও পড়িনি! প্রকৃত মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য, শাহাদাতের তামান্না, মুনাফিকদের গাদ্দারী, সামান্য ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য, মুসলিম শাসকদের বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ, চেঙ্গিস খানের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বইটি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তাহির বিন ইউসুফের বীরত্ব, সরলতা, চরিত্র, ঈমানী দৃঢ়তা,

www.amarboi.org

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা আমার তরুণ মাতৃহৃদয়ের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায়ই আমার সন্তানের নাম রাখলাম 'তাহির'।

কিছুদিন পরেই আমার স্বপ্নের তাহির পৃথিবীর আলো বাতাসে এলো। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম আমি। সেই সাথে আমার ধর্মীয় অনুভূতিটাও যেনো কিছুটা লোপ পেতে লাগলো। আমার ছেলের বয়স যখন দুই বছর, তখনই তার গলায় সুরের কারুকার্য দেখে, যে শুনতো সেই অবাক হয়ে যেতো। ক্লাস ফাইভের সেই স্মৃতিটা আমার মধ্যে আবার জেগে উঠলো। ভাবতেই দেহ মন রোমাঞ্চিত হতো। আমার ছেলে আর আমি একসাথে ফাংশানে গান গাবো।

প্রায় ছ'মাস পর শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলাম। আট ভাইবোন আমরা। আমিই সবার বড়। আর শুধু আমারই বিয়ে হয়েছে। তাই আমি বাড়িতে এলে যার যতো কথা আছে, কোথায় কোন ঘটনা ঘটেছে, সব বলা হতো। বাড়িতে যেনো আনন্দের ঢেউ খেলে যেতো। বিভিন্ন কথাবার্তা চলছে এর মধ্যে আমার মেঝবোনটা বলে উঠলো, জানো আপা সরোয়ার মামা এখন আর কারো সাথে দেখা করেন না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। দেখা করে না মানে? উত্তর দিলেন আম্মা, 'ও তুই জানিস না বুঝি। খুব আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে সরোয়ার।' হেসে ফেললাম, খুব ধার্মিক হয়েছে সরোয়ার মামা। ভালো, তা না হয় হলো, তো দেখা করবে না কেনো?

ঃ দেখা করে না মানে মেয়েদের সাথে দেখা করে না। পর্দা করা ফরয। আম্মাই উত্তর দিলেন।

ঃ আমার সাথেও দেখা করবে না? মামা যে আমার কাছে গান শিখতে চেয়েছিল, বলে হাসতে লাগলাম আমি।

ঃ না-না হাসির কথা নয়। খুব পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর মনেই হয় না সেই সরোয়োর। বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন আম্মা।

সরোয়ার মামা আমাদের আপন মামা নয়। আমাদের বাসায় ভাড়া থাকতেন। কিছু একটা বলতে হয় এক জায়গায় থাকলে তাই তিনি আমার আম্মাকে আপা বলে ডাকতেন। সেই সূত্রে মামা। সরোয়ার মামার স্ত্রী মানে মামী আমার চেয়ে ২/১ বছরের বড় হয়তো হবেন। খুব আধুনিকা নামায রোযার ধার খুব কমই ধারেন। আর মামা বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। রবীন্দ্র ভক্ত, আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, 'তোমার কাছে গান শিখবো।'

সেই মামা-মামী সম্পর্কে এসব কাহিনী শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। মামারা আর আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকেন না। আমাদের বাড়ির পাশেই জমি কিনে বাড়ি করেছেন। হাজির হলাম সরোয়ার মামার বাড়ি। প্রথমেই মামীর সাথে দেখা হলো। বারান্দায় বসে তরকারী কুটছিলেন। আমাকে দেখে হাসি মুখে বলে উঠলেন, আসসালামু আলাইকুম। কবে এসেছ রুমী, কেমন আছ? অবাক হলাম। হাসি চেপে উত্তর দিলাম, ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম। অবাক হওয়ার কারণ মহিলাদের ভিতর সালামের প্রচলন তো

www.amarboi.org

আমাদের সমাজে নেই বললেই চলে। বিশেষ করে মামীর মুখে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' শুনে একেবারে নতুন মনে হলো আমার কছে।

ঃ ভালো আছি। মামা কোথায়?

ঃ ঘরেই আছে। কবে এসেছ?

ঃ কাল এসেছি। বলতে বলতে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

ঃ তোমার মামা তো মুসলমান হয়েছে। মেয়েদের সাথে দেখা করে না। একটু বিদ্রূপের মতোই কানে বাজল কথাটা।

ঃ আমার সাথে দেখা করবে না মামা? বলে ঘরের মধ্যে এক পা দিতেই মামা বললেন, ওখানেই থাকো মা। থমকে দাঁড়ালাম। বললাম, কেন মামা? পর্দা তো মনের ব্যাপার। তাছাড়া আমরা তো মামা-ভাগ্নী।

ঃ কুরআনে আল্লাহ পাক চৌদ্দ জনের সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। সেই চৌদ্দ জনের মধ্যে তুমি নেই মা। তুমি মন খারাপ করো না রুমী। তোমাকে আমি ভালোবাসি আমি কিছুতেই চাই না তুমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলো। তুমি অনেক পড়াশুনা করেছ কিন্তু কোনো দিন কুরআন পড়নি। চরমোনায়ের পীর সাহেব মাওলানা ফজলুল করিমের কাছে যেয়ে আমার ভুল ভেঙে গেছে। আমি ওয়াদা করে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। আর আমি জাহেলিয়াতের জীবনে ফেরত যাবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মামীর কাছে এসে বসলাম। মামী বিরক্ত মুখে বললেন, এ কেমন যন্ত্রণায় পড়লাম বল দেখি। আমার বোনদের সাথেও দেখা করে না। প্রায় সারা রাতই নামায পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদেই পড়ে।

ঃ ভালো তো। কিন্তু এমনটি হলো কিভাবে?

ঃ আমার বান্ধবীর বাসা থেকে সেদিন একটা বই নিয়ে এসেছিলাম। বইটা তোমার মামা পড়লো অনেক রাত জেগে। সকালে উঠেই মসজিদে গেল নামায পড়তে। একটু অবাকই হলাম। কিন্তু মসজিদ থেকে এসে যা বললো তাতে তো আকাশ থেকে পড়লাম। বললেন মামী।

ঃ কি বললো।

ঃ বললো, আমি চরমোনায় যাচ্ছি। ফিরতে ২/৩ দিন লাগবে। তারপর চলে গেল চরমোনায়। তিনদিন পর বাড়ি এলো। সার্ট-প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ইয়া বড় একটা জুব্বা পরে এসেছে। আমার জন্য বোরকা নিয়ে এসেছে। আমার মামাতো ফুফাতো ভাইদের সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দিয়েছে। রাগ করে তারা কেউ আর আমার বাড়ি পর্যন্ত আসে না।

বললাম, মামী সেই বইটা আছে? দেন তো একটু।

মামী উঠে ঘর থেকে বইটা আমাকে এনে দিলেন। চরমোনায়ের প্রাক্তন পীর মাওলানা এসাহাক সাহেবের লেখা পর্দা সংক্রান্ত ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা।

বইটা হাতে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মনোযোগ সহকারে বইটা ২/৩ বার পড়লাম। সূরা নূর ও আহযাবের উদ্ধৃতি দিয়ে পর্দা কিভাবে করতে হবে, না করার পরিণতি সম্পর্কে

www.amarboi.org

ব্যাপক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন লেখক। বুকের ভিতরটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। মনে হলো তাই তো পর্দা তো করি না। আল্লাহ পাকের স্পষ্ট নির্দেশ বাড়ির বাইরে গেলে অবশ্যই যেনো পোশাকের ওপর আর একটি পোশাক দিই। নির্দিষ্ট চৌদ্দ জন মাহরম পুরুষ ছাড়া যেনো আর কারো সাথে দেখা না করি। বুকের ভিতর কেমন যেনো একটা কষ্ট অনুভূত হতে লাগলো। তওবা করলাম আর বেপর্দায় বাইরে যাবো না, কুরআনে নির্দিষ্ট ঐ চৌদ্দ জনের বাইরে কারো সাথে খোলামেলা দেখাও করবো না।

আমাদের বাসাতেই একটা রুমে ভাড়া থাকতো অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র মুজিব। আমার ছেলে তাহিরকে খুব ভালোবাসত। আমিও ওকে খুব স্নেহ করতাম। কলেজ থেকে এসেই দৌঁড়ে, মামা কই, আমার-মামা কই— বলতে বলতে রুমে ঢুকতো। কতো কথা বলতো যে .....। তওবা করেছি আর বেপর্দা হব না। এ কথা শুনে আমার মেঝ বোন মাহমুদা বললো, আপা মুজিব ভাইর সাথে কিভাবে পর্দা করবে? ও তো এক্ষুণি কলেজ থেকে এসেই ঘরে ঢুকবে।

একটু ভেবে বললাম তাহলে ওকে দিয়েই পর্দা শুরু করবো। তাই করলাম। মুজিব ঘরে ঢুকতেই ওকে থামিয়ে দিলাম। গতকাল মামা যেভাবে আমাকে বলেছিলেন আমিও ওকে সেভাবে বললাম। কিন্তু আমি যেমন সহজভাবে বিষয়টা গ্রহণ করেছি মুজিব তা পারলো না। ও প্রথম খুবই মন খারাপ করলো তারপর কয়েকদিন পর এখান থেকে বাসা বদল করে চলে গেল। জানি না এখন মুজিব কোথায় আছে কেমন আছে। যে কথাটা ওকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম সেই কথাটা ওকে বুঝাতে পারিনি বলেই তো মুজিব মনে কষ্ট পেয়েছিল।

এ ঘটনার আগে অবশ্য আমার পর্দা করার ব্যাপারে আর একটি ঘটনা আছে আমার ছেলের বয়স তখন এক বছর। ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে আমাকে আমার স্বামী তার চাকরিস্থল কিশোরগঞ্জ জেলার আটগ্রাম থানায় নিয়ে গেলেন। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে গেলাম। হাওড় এলাকা, গ্রাম্য পরিবেশ। আশেপাশের বাড়ি থেকে বিভিন্ন মহিলারা আমাকে দেখতে আসছে। প্রথমেই আসলেন আমাদের বাড়িওয়ালার পুত্রবধূ। আমার সমবয়সী। বাড়িওয়ালার স্ত্রীও এসেছে। কথা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ তো তোমার বয়সী মেয়ে অথচ কতো ভালো আর তোমরা কি কর? পুত্রবধূ একটু লজ্জা পেয়ে মাথায় শাড়ীর আঁচল তুলে দিল। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তার মানে? আমি কি ভালো? মহিলা স্নেহার্দ্র স্বরে বললো, ভালো না মানে? তোমার মতন এই বয়সে কয়টা মেয়ে পর্দায় থাকে?

পর্দায় থাকি আমি? কে বললো আপনাদের?

কেন? তোমার স্বামী বলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি বলেছে আমার স্বামী?

বলেছে তুমি কোনো পরপুরুষের সাথে দেখা করো না। খুব পর্দায় থাকো। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম, কিছু বললাম না। এরপর আরও কয়েক জন মহিলা আসলেন তারাও ঐ একই কথা বললেন আমাকে।

বেলা ৩টার দিকে নূর বাসায় এলো। তাকে বললাম, কি ব্যাপার মানুষের কাছে এসব কথা প্রচার করেছ কেন?

www.amarboi.org

নূর হাসিমুখে বললো, কি সব কথা?

রাগ করে বললাম, কিসব কথা জান না? আমি খুব পর্দা করি। পরপুরুষের সাথে দেখা করি না। এসব কেন বলেছ মানুষের কাছে? আরে বাদ দাও ওসব কথা। একা একা ছিলাম কি দিয়ে কি বলেছি তা মনে আছে নাকি? তাতে কি হয়েছে? তোমাকে কেউ খারাপ বলেছে? আমি আরও রেগে গেলাম। খারাপ বলুক আর ভাল বলুক তা কথা নয়, তুমি কেন এসব কথা বলে বেড়ালে তাই বলো। নূর হাসতে লাগলো, বলেছি বলেই কি তোমার পর্দা করতে হবে নাকি? তুমি অন্য পুরুষের সাথে কথা বলবে? দাঁড়াও বিকেলেই আমি পাঁচজন পুরুষ নিয়ে আসবো বাসায়। যতো পার কথা বলবে তুমি। মেজাজটা কেমন খারাপ হয়!

এরপর আমি সত্যি সত্যি পর্দা করতে লাগলাম। যদিও স্বতস্ফূর্তভাবে নয়, আল্লাহর ভয়ে নয়, ইসলামের বিধান হিসেবে নয়, দায়ে পড়ে। লোকজনের কাছে প্রচার হয়ে গেছে ইঞ্জিনিয়ার নূর মোহাম্মদের স্ত্রী খুব পর্দা করে চলে। অতএব না করে উপায় কি? ছয় মাস ছিলাম আমি আট গ্রাম। ছয় মাস তো না যেনো ছয় যুগ পার হয়েছে আমার। ছয় মাস পরে নিজের পরিবেশে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি আমি। কিন্তু তারপর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় বোরকা পরে যাই, খোলামেলা যেতে পারি না কেমন যেনো অভ্যস্ত হয়ে গেছি এই ছয় মাসে।

এভাবেই কাটে আরো ছয় মাস। আমার ছেলের বয়স তখন দুই বছর আর আমার বয়স বাইশ। আমার জীবনের সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। পীর মুরিদি পরিভাষায় যাকে বলে খাসপর্দা শুরু করি আমি। খবর পেয়ে আমার সেই মামী ছুটে এলেন, মামাও এলেন। পর্দার আড়াল থেকে বললেন, রুমী আমি কতো যে খুশি হয়েছি মা, তোমার পর্দা করার কথা শুনে। আবেগে কেঁদে ফেললেন মামা, তারপর বললেন, সামনের সপ্তাহে পীর সাহেব আসবেন যশোরে। তুমি মুরীদ হয়ে যাও মা। তোমার মামী আছে তোমার মা আছে আরো কয়েকজন মহিলাদের দাওয়াত দাও। আমার বাসায় একটা মাহফিল করবো। আমি হুজুর কেবলাকে তোমাদের কথা বলে নিয়ে আসবো। খুব উৎসাহের সাথে রাজী হলাম। পাড়ার সব মহিলাদের দাওয়াত দিলাম। অনেকেই হাজির হলো। নির্দিষ্ট সময়ে হুজুর এলেন। চরমোনায় পীর হযরত মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব। বক্তৃতায় তিনি কি কি বলেছিলেন এতোদিন পর তা সব মনে নেই। তবে পর্দা, স্বামীর খেদমত, নামায আর জিকিরের প্রসঙ্গে খুব আবেগের সাথে কথা বলেছিলেন। এর পর তার পাগড়ি ধরে বয়াত হলাম। তখনকার সে অনুভূতি আর আবেগের কথা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

আমি মুরীদ হলাম। সকাল বিকাল সবক আদায় করতে লাগলাম। আমার মা এবং আরো মহিলারা মুরীদ হলেন। আমাদের মহল্লার চেহারাটাই যেনো বদলে গেল।

ইতিমধ্যে অনেক চেষ্টা করে ইঞ্জিনিয়ার (নূর) বদলী হয়ে অষ্ট গ্রাম থেকে মাদারীপুর জেলার শিবচর থানায় এল। আমার পরিবর্তন দেখে প্রথমে খুব অবাক হলো তারপর খুশি

www.amarboi.org

হলো। আমাকে নিয়ে এলো শিবচরে। থানা পরিষদের কোয়াটারে। কয়েক দিনের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল ইঞ্জিয়ির নূর মোহাম্মদ সাহেবের স্ত্রী খুবই পর্দা করেন। আমি এদিকে কোথাও বের হতাম না। কারোর বাসায় যেতাম না। তবে আমার বাসায় অন্যান্য বাসার মহিলারা আসতেন। কেউ ভালো বলতেন, কেউ বলতেন মনে হয় অশিক্ষিত, লোকের সাথে মিশতে পারে না, তাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কারো সাথে মিশতে দেয় না। একদিন টিএফপিও থানা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার সাহেবের স্ত্রী খুব অনুরোধ করলেন তার বাসায় যাওয়ার জন্য। মাগরিবের পরে যাবো বলে তাকে কথা দিলাম। আমার ওপরতলার প্রতিবেশী কুম কুম আপাকে নিয়ে তার বাসায় গেলাম। বাসায় ঢুকতেই হারমনিয়ামের শব্দ শুনলাম। হারমনিয়ামে তখন জাতীয় সংগীতের সুর তোলার চেষ্টা চলছে। বার বার ভুল হচ্ছে। তখন মনে হচ্ছিল একটু হারমনিয়ামটা ধরি। তবুও ধরিনি।

১৯৮৩ সাল। ততদিনে আমার দ্বিতীয় ছেলে পৃথিবীতে এসেছে। নিষ্ঠার সাথে ঘর সংসার, স্বামীর খেদমত, সন্তান পালন আর সবক আদায় করি। ইখলাসের সাথে নফল নামায আদায় করি। একদিন সকাল দশটার দিকে নূর অফিসে চলে গেছে। ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আমি রান্না করতে যাবো, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। কে? প্রশ্ন করে দরজা খুলে বেশ অবাক হলাম। তিনজন বোরকা পরিহিতা মেয়ে। মহিলা না বলে মেয়ে বলছি। কারণ তিনজনই বোরকার সাথে সালোয়ার কামিজ পরিহিতা। (তখন বয়স্ক বাঙালি মহিলাদের সালোয়ার কামিজ পরার প্রচলন ছিল না।) তাদের পরিচয় শুনে আরো অবাক হলাম, তারা তিনজনই কলেজের ছাত্রী। কলেজের ছাত্রীরা বোরকা পরে কলেজ যায় এতো আমি কখনো দেখিনি, শুনিওনি।

তারা পরিচয় দিতে গিয়ে বললো, ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মী। এই নামে কোনো সংস্থা আছে তা তো আমার জানা ছিল না। তারা এই উপজেলা ক্যাম্পাসে একটা সাপ্তাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা করতে চায়। আমি যেনো দাওয়াতী কাজ করি এবং আমার বাসায় বৈঠকের ব্যবস্থা করি। আমি যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এমনি একটা কাজ করার জন্য আমি তো উদগ্রীব হয়ে ছিলাম। তারা যাওয়ার সময় আমাকে কয়েকটা বই— নামায রোযার হাকিকত, হাদীসের আলোকে মানব জীবন আর তাফহীমুল কুরআন ১ম ও ১৯শ খণ্ড দিয়ে গেলেন।

এই তিনটি গ্রন্থ আমার জীবনে যেনো বিপ্লব এনে দিল। ধর্মীয় গ্রন্থ বলতে চরমোনায়ের পীর সাহেবের মুরীদ হওয়ার আগে পড়েছি বিশ্বনবী আর নেয়ামূল কুরআন। মুরীদ হওয়ার পরে পড়েছি দাদা হুজুর হযরত মাওলানা এসাহাক সাহেবের লেখা সাতাশটি পুস্তিকা ও বেহেশতি জেওর। নামায রোযার হাকিকত পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতো সুন্দর সাবলিল স্পষ্ট ধারণার কোনো বই আমি কোনো দিন পড়িনি। বইটি পড়া শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। মনে হলো এতোদিন আমি নামায পড়িনি, রোযা করিনি, কোনো ইবাদাতই বুঝি এতো দিন আমার হয়নি। মনে হলো ইবাদাত কাকে বলে তা আমি এতো দিন জানতামই না।

www.amarboi.org

'হাদীসের আলোকে মানব জীবন' বইটি আমার জীবনের প্রথম হাদীস গ্রন্থ পড়া। এর আগে অন্যান্য বইয়ের মধ্যে হাদীসের উদ্ধৃতি পড়েছি কিন্তু এমন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ পড়িনি। আর তাফহীমুল কুরআনের কথা কি আর বলবো? কুরআন পড়ে যে এতো স্বাদ পাওয়া যায় তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। একদিনের কথা বলি সকাল নটায় নূর অফিসে চলে গেল। আমি ছোট ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে গোসল করে এলাম। রান্না করতে যাবো। কাজের বুয়া আসেনি। গতকাল রাতে কুরআন পড়েছি তারপর আর সময় পাইনি। পড়ার জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করছে। ভাবলাম মাত্র ৩০ মিনিট কুরআন শরীফ পড়ে তারপর রান্না করতে যাবো।

কুরআন শরীফ পড়ছি এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। আমি দরজার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে? ওদিক থেকে নূর বললো আমি, খোল। দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার এতো তাড়াতাড়ি?

নূর অবাক হলো, তাড়াতাড়ি মানে? দুইটা বাজে।

ঃ আযান হয়ে গেছে? প্রশ্ন করতেই নূর বললো, নামাযও হয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে নূরের দিক তাকিয়ে থাকলাম। নূর হাসি মুখে বললো, কি হয়েছে?

ঃ আমি রান্না বান্না কিছু করিনি?

ঃ কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? না, কুরআন শরীফ পড়ছিলাম। কিভাবে যে এতোটা সময় চলে গেছে আমি বুঝতে পারিনি। গতরাতে সূরা বাকারা শুরু করেছিলাম আজ শেষ করে ফেলেছি। চার ঘন্টার বেশি সময় ধরে আমি কুরআন পড়েছি, তা কি করে সম্ভব হলো? অথচ আমিই তো আগে খতম করার নিয়তে যখন পড়তে বসতাম এক ঘন্টা পড়লেই অস্বস্তি লাগতো।

ছাত্রী সংস্থার মেয়েরা এসেছিল এক বৃহস্পতিবারে, পরবর্তী বৃহস্পতিবার আসার আগেই তিনটি গ্রন্থই শেষ হয়ে গেল। আমি 'নামায রোযার হাকিকত' আবার পড়লাম। এতো মজার বই যে আমি কোনো দিন পড়িনি। পরবর্তী সপ্তাহে আসমা, রুবীনা ও আর একটা মেয়ে এলো— তার নাম এতো দিন পর মনে করতে পারছি না।

মেয়ে তিনটির কথা বলার ধরন এতো সুন্দর তা দেখে মনে হলো ওরা বুঝি এই সমাজের মেয়ে নয়। হাসি মুখে জানতে চাইলো আমি বই এবং কুরআন শরীফ পড়েছি কি না। আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম, এ বই তোমরা কোথায় পেয়েছ? কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? তোমাদের ভাইকে দিয়ে শিবচর বাজারের প্রতিটি বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়েছি, কোথাও তো পেলাম না।

রুবীনা বললো, এগুলো আমাদের সংগঠনের বই, ঢাকা ছাড়া পাওয়া যায় না।

ঃ তাহলে এ বই তোমরা পাবে না। বিশেষ করে নামায রোযার হাকিকত বইটি। হয় তোমরা বইটা আমার কাছে বিক্রি করো। না হয় প্রেজেন্ট করো। আর তাও যদি না হয় তাহলে বইটা আমি তোমাদের ফেরত দেবো না, যা খুশি তাই করো।

মেয়েরা হাসতে হাসতে বললো, ঠিক আছে বইটি আপনাকে আমরা প্রেজেন্টই করলাম।

www.amarboi.org

আর একটি মেয়ের নাম মনে পড়ছে। ওর নাম শিরিনা। শিরিনাই ওদের কলেজ শাখার সভানেত্রী। আমার বাসায় নিয়মিত বৈঠক হতে লাগলো। প্রতি সপ্তাহে ওরা আসে। ইতিমধ্যে ওরা আমাকে অনেক বই দিয়েছে। ইসলামের হাকিকত, ঈমানের হাকিকত, একমাত্র ধর্ম, সাফল্যের শর্তাবলী, তাফহীমুল কুরআনের- ২য় খণ্ড, ৫ম খণ্ড, ৯ম খণ্ড ও ১৭ খণ্ড। আমি একেকটা বই পড়ি আর মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে যাই।

একদিন প্রশ্ন করলাম, 'এই বইগুলো তো সব অনুবাদ মূল লেখকের বাড়ি কোথায়?'

ওনার বাড়ি পাকিস্তানে। তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা। চমকে উঠলাম! জামায়াতে ইসলামী! এ নাম তো আমার পরিচিত। সবচেয়ে অপছন্দনীয় নাম। নিজের অজান্তেই বুঝি বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেয়েছিল মুখে। শিরিনা বললো, আপনি জামায়াতে ইসলামী পছন্দ করেন না?

স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলাম 'না'।

শিরিনা সাথে সাথে প্রশ্ন করলো, কেনো?

ঃ ওরা রাজাকার, দেশের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু, মানবতার শত্রু।

ওরা ইসলামের নামে ইসলামের সাথে দুশমনি করে। তোমরা কি জামায়াতে ইসলামী করো?

ঃ না, না আমরা জামায়াতে ইসলামী করবো কেনো?

আমরা ইসলামী ছাত্রী সংস্থা করি। আগামী সপ্তাহে আমাদের বড় আপা আসবে। তার সাথে আলাপ করলে আপনি সব বুঝতে পারবেন।

চলে গেল ওরা, মনের মধ্যে যেনো দ্বন্দ্ব চলছে। মাওলানা মওদূদী র. লিখিত এই সব বই আর আমার জানা জামায়াতে ইসলামী কিছুতেই মেলাতে পারছি না। এ ভাবেই চলে একটি সপ্তাহ। শিরিনা, রুবীনা ওদের বড় আপাকে নিয়ে এসেছে আজকের বৈঠকে। বড় আপা মানে ওদের বড় বোন নয়। সাংগঠনিক আপা। এই শিবচর উপজেলারই মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী। নাম সাইদা পারভিন শিউলি।

শিউলি বক্তব্য রাখলো মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর। কি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, কথা বলার ভঙ্গি, কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ধৃতি পেশ— সব কিছু মিলিয়ে অপূর্ব বক্তৃতা। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে মোনাজাত করলাম। অন্যান্য মহিলারাও মুগ্ধ হয়েছে শিউলির কথায়।

সবাই চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, আপনি ভার্সিটিতে পড়ে কুরআন-হাদীসের ওপর এমন ধারণা কিভাবে পেলেন?

শিউলি হাসি মুখে বললো, আপনিও পেতে পারেন। শুধু পড়াশুনা করলেই হয়। আপনি লক্ষ্য করেছেন আমাদের সমাজ থেকে কুরআন-হাদীস অর্থসহ পড়া বলতে গেলে উঠেই গেছে? এ কারণেই আমরা কিছু জানি না।

বললাম তা ঠিক। তারপর হঠাৎ করেই প্রশ্ন করলাম আপনারা কি জামায়াতে ইসলামী করেন?

শিউলি জোর দিয়ে বললো, না। আমরা জামায়াতে ইসলামী করি না। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। সাইদা পারভিন শিউলি আমাকে এরপর যা বুঝালো তার মূল

www.amarboi.org

বিষয় 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির' দুই ভাগ হয়ে গেছে। একদল জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করে অন্য দল ইরানপন্থী। ইরানপন্থীরা জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করে না। ছাত্রী সংস্থার অবস্থাও তাই। আমরা জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করি না। ইরানে যেভাবে ইসলামী হুকমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরাও সেভাবে কাজ করবো।

আমি বললাম, আপনাদের এই যে সংগঠন তাতো আমি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের কলেজে তো ছিলই না, যশোরের অন্য কোনো কলেজেও আছে বলে আমার মনে হয় না।

শিউলি বললো, ১৯৭৯/১৯৮০ ছিল না। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। আমারই ক্লাসমেট যশোরের এক মেয়ে আইনুন্নাহার আঞ্জু যশোরের দায়িত্বশীলা।

আমি আবার বললাম, আমি তোমাদের সাথে আছি। ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মাল দিতে হবে কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর সাথে মিলে নয়। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা কোনো অবস্থাতেই ভালো লোক নয়। জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযম যুদ্ধের সময় ফতোয়া দিয়েছিল– এ দেশের মেয়েরা গণিমতের মাল। ওরা রাজাকার .....।

আমার কথা শেষ না হতেই শিউলি প্রতিবাদ করে উঠলো। না না ওসব কথা সত্যি নয়। এসব অপপ্রচার। সব মিথ্যা। ইসলাম বিদ্বেষীরা এসব অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি খুব জ্ঞানী লোক। ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব অসম্ভব ভালো মানুষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের সাথে আমাদের মতে মিলছে না তাই।

ঃ যাই হোক জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমি নেই। এই হলো শেষ কথা।

এর কিছুদিন পরেই নূর এলো বদলী হয়ে যশোরে। আমি যশোর আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলাম দুটি কারণে ১. আব্বাকে সাথে নিয়ে মাওলানা মওদূদীর বইগুলো পড়ার জন্য বিশেষ করে 'নামায রোযার হাকিকত' বইটি। ভালো কোনো বই আব্বার সাথে বসে পড়া আমার ছোট বেলার অভ্যাস, সে পড়ার মজাই আলাদা। কিন্তু বইটি আব্বাকে দেখাতেই তিনি বললেন মাওলানা মওদূদীর বই। কোথায় পেয়েছ? কে দিয়েছে? তাকে বিস্তারিত সব বললাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মাওলানা মওদূদীর লেখা আমারও খুব ভালো লাগে। কিন্তু পীর সাহেব হুজুর মাওলানা মওদূদীকে একদম পছন্দ করেন না। উল্লেখ্য তখন আমার আব্বা আম্মাও চরমোনায়ের মুরীদ হয়ে গেছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এই বই অপছন্দ করার কি কারণ থাকতে পারে?

ঃ এই লোকই যে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা তা কি তুমি জান?

ঃ জানি, জামায়াতে ইসলামী না করলাম কিন্তু এই বইগুলো পড়া খুব জরুরী আব্বা। আর যে লোক এই সব বই লেখে ইসলামকে এভাবে বুঝায়, এমনিভাবে কুরআনের তাফসীর করে, সে লোক খারাপ হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের দেশের জামায়াতে ইসলামীর লোকজন খারাপ হতে পারে। তাই বলে এই বইগুলো তো খারাপ নয়।

www.amarboi.org

আব্বা চুপ করে গেলেন, কিন্তু আমার মন খারাপ হলো এই কারণে যে আব্বা বইটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

আমার পরবর্তী মিশন হলো 'ছাত্র শিবির' আর 'ছাত্রী সংস্থা' খুঁজে বের করা। আর ওদের সাথে মিশে সংগঠনকে দ্বিধা বিভক্ত করা। ছোট ভাই মিজানকে বললাম, কলেজে শিবিরের সন্ধান করতে আর বোন মাহমুদাকে বললাম ছাত্রী সংস্থার খোঁজ নিতে। মিজান ছাত্র শিবির খুঁজে পেল এবং ছয় মাসের মধ্যে আদর্শ কর্মী হয়ে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সাথী হয়ে গেল। এখন আমাকেই অনেক কিছু বুঝায়। এদিকে ছাত্রী সংস্থাও পাওয়া গেল। মাহমুদা আমার সম্পর্কে ওদের কাছে কি বলেছে জানি না, একদিন ছাত্রী সংস্থার কয়েকজন কর্মী আমাদের বাসায় এলো আমার সাথে সাক্ষাত করতে। শিবচরের মতোই চমৎকার চারটি মেয়ে। চমৎকার তাদের কথা বলার ধরন তখনই মনে মনে টার্গেট নিলাম কিভাবে এদেরকে জামায়াতী চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। ওরাও নিশ্চয়ই সেদিন থেকেই আমাকে টার্গেট নিয়েছিল। ওদের সব বৈঠকেই আমি আমার দু'বোনকে নিয়ে হাজির হতে লাগলাম। পাশাপাশি আমি আমার আদর্শও ওদের বুঝাতে লাগলাম। জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। সত্যিকারের আলেম ওলামারা কেউই জামায়াতে ইসলামীকে পছন্দ করে না ইত্যাদি। ওরা চুপ করে আমার কথা শুনতো, প্রতিবাদ করতো না। চরমোনায় পীর সাহেবের দেয়া সবক অনুযায়ী প্রত্যেক বৈঠকে সবাইকে নিয়ে জিকির করতাম। ওরাও আমাদের সাথে সাথে জিকির করতো। তখন যশোরের ছাত্রী সংস্থার শহর সভানেত্রী ছিল শাহীনা আক্তার। অন্যান্য দায়িত্বশীলাদের মধ্যে আইনুন্নাহার আঞ্জু, জোৎস্না, শামিমা পারভিন, ঝুনু আরো বেশ কয়েকটি মেয়ে ছিল। আমি ওদের কাছে আইনুন্নাহার আঞ্জু সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ওরা বললো, তিনি আমাদের বড় আপা। ছাত্রী সংস্থা যশোর জেলার সভানেত্রী। আগামী সপ্তাহে বাড়ি আসবেন। আসলে আপনার কাছে নিয়ে আসবো। সত্যিই পরের সপ্তাহে আঞ্জু আপা আসলো। এতো সুন্দর করে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে কথা বলতে লাগলো। প্রথম সাক্ষাতেই আঞ্জু আপাকে আমার খুব ভালো লাগলো। কথা বলার ধরনটা কি যে সুন্দর। ওর কিছু কথা আমার আজও মনে আছে। আমিও এখন বিভিন্ন জায়গায় কথাটা বলি। ও বলেছিল, আপা কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে যেমন তার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, তেমনি কারো সাথে শত্রুতা করতে হলে, দুশমনি করতে হলেও তার সম্পর্কে জানা উচিত। না জেনে কি কারো সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা ঠিক? আমি মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। বললাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম বলেছেন এদেশের মেয়েরা পাকিস্তানীদের জন্য.....।

আঞ্জু আপা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, কে বলেছে আপা। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের মতো শরীফ লোকের মুখ থেকে এসব কথা বের হতে পারে না? এগুলো মিথ্যা প্রচার। আপনি কি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে দেখেছেন কখনো? আমি বললাম না দেখিনি কখনো। আঞ্জু আপা আবেগের সাথে বললো, আপনি দেখলে বুঝতেন কেমন পবিত্র আর নূরানী সেই চেহারা। আপনি কি বিশ্বাস করেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীরা ইসলামের শত্রু?

www.amarboi.org

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, তা অবশ্যই। বামপন্থী আর ধর্ম নিরপেক্ষতা তো একই জিনিস।

আঞ্জু আপা আবার বলতে লাগলো, এই বামপন্থী আর ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা—যারা ইসলামের কথা বলে, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে তাদের প্রধানতম শত্রু। এমন কোনো মিথ্যা নেই যা বলতে এদের মুখে আটকায়। আর মুসলমানদের ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্যই এরা এই সব কথা বলে বেড়ায়। ওদের প্রচার মাধ্যমগুলো তা ফলাও করে প্রচার করে।

আর আমরা সাধারণ মুসলমানরা কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই ওদের মিথ্যা প্রচারণার ফাঁদে পা দিই। আপা আপনাকে আমি জামায়াতে ইসলামীতে শরিক হতে বলি না শুধু জামায়াত প্রকাশিত বইগুলো আপনি পড়ুন।

শহর সভানেত্রী শাহিনা বলে উঠলো, তিনি তো মাওলানা মওদূদী র.-এর খুব ভক্ত।

হাসলো আইনুন্নাহার আপা। তারপর বললো, তাহলে বোধ হয় আপনি জামায়াত থেকে দূরে থাকতে পারবেন না।

আমি বললাম আমি মাওলানা মওদূদী র. সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে চাই। কারণ চরমোনায় পীরের মুরীদরা তার সম্পর্কে খুবই বাজে মন্তব্য করেছেন। অথচ তার লেখা বইগুলো পড়লে আমার কাছে মনে হয় জ্ঞানের এক একটা বন্ধ দরজা খুলে যায়। পরদিন আইনুন্নাহার আব্বাস আলী খান সাহেবের লেখা 'মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি আন্দোলন একটি ইতিহাস' গ্রন্থটি আমার জন্য পাঠিয়ে দেন। গভীর মনোযোগের সাথে বইটি আমি অধ্যয়ন করি। আমার জন্য খুলে যায় নতুন এক পৃথিবীর দ্বার। কি যে ভালো লাগা আর পবিত্র দায়িত্বানুভূতির সে রাজ্য। খুব আফসোস হতে লাগলো—লেনিন, কাল মার্কস, হিটলার, মাও সেতুং, শেখ মুজিব আরো কতো জনকে কতো কতো রঙে কতো ঢঙে জেনেছি। অথচ এই মানুষটির কথা কেন জানতে পারিনি?

আইনুন্নাহারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো।

এদিকে আমার সরোয়ার মামা আর তার পীর ভাইয়েরা অস্থির হয়ে গেলেন, তাদের তৈরি করা মেয়েটা জামায়াতে ইসলামীর খপ্পরে পড়ে যায় কিনা। আব্বা একদিন বললেন, আমার কয়েকজন পীর ভাই এসেছেন, তোমার সাথে কথা বলতে চান। বেশ তো কথা বলবে। বলে আমি দরজার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। পর্দার ওপাশে ড্রইংরুমে সরোয়ার মামাসহ আরো কয়েকজন আছেন। সরোয়ার মামাই বললেন, রুমী তোমার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে।

বললাম, আচ্ছা মামা বলেন কি কথা?

ঃ জামায়াতে ইসলামীর মেয়েরা তোমার সাথে কথা বলতে আসে, বই পড়তে দেয় এসব কিন্তু ঠিক না। তা কি তুমি বুঝ? আমি বললাম, মামা ওরা কেউ জামায়াতে ইসলামী করে না। আর জামায়াত করা লাগকে এ ধরনের কোনো বইও ওরা এ পর্যন্ত আমাকে পড়তে দেয়নি। শুধু আমাকে পড়তে দিয়েছে কুরআনের তাফসীর.....। আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই ওপাশ থেকে একজন বলে উঠলেন 'মওলানা মওদূদীর তাফসীর? সর্বনাশ!'

www.amarboi.org

মাওলানা মওদূদীর করা কুরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'। সর্বনাশের কি হলো?

এরপর তারা সবাই মিলে আমাকে যা বুঝালেন তার মূল কথা হলো মাওলানা মওদূদী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। তার সব সাহিত্য কর্মকাণ্ডই ফেতনায় পরিপূর্ণ। সে কোনো আলেম নয়। হক্কানী আলেমগণ তার বই পুস্তক এবং তাফসীর পড়তে নিষেধ করেন। ঈমান এবং আমল রক্ষা করতে হলে মওদূদীর এই সব বই পুস্তক থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি মাওলানা মওদূদীর কোনো বই পড়েছেন?

ঃ না, না আমরা ঐ সব পড়ি নাকি? মুরব্বীদের নিষেধ আছে।

আমি আবার বললাম, আচ্ছা কি ধরনের ভুল ব্যাখ্যা মাওলানা মওদূদী করেছেন তা আমাকে একটু জানান।

ঃ ঠিক আছে পরে জানাব বলে, কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হয়েই তারা চলে গেল। আমি আব্বাকে বললাম, আব্বা কি করবো এখন?

আব্বা বললেন, কি আর করবে ওসব বই পুস্তক পড়লে মুরুব্বীরা যখন বলছে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তখন না পড়লেই হলো।

আমি তখন ভাবছিলাম অন্য কথা। এ যেনো সেই ১৪০০ বছরের আগের পুরানো কথার নতুন সংস্করণ। তারা যেমন বলতো, 'মুহাম্মদ স.-এর কাছে কেউ যেয়ো না। তাঁর কথা শুনো না, শুনলেই তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এরাও তেমন বলছে। বললাম। আব্বা আমি যখন আকবর হোসেনের অশ্লীল উপন্যাস পড়তাম। আম্মা বকাঝকা করতেন। আপনি বলতেন, আরে পড়ুক, দেখুক কোন লেখক কেমন লেখে। আমি যখন সিনেমার পত্রিকা, বিচিত্রা, ঝিনুক ইত্যাদি পড়তাম তখন বিভ্রান্ত হলাম না। আর এখন কুরআনের তাফসীর পড়ে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাবো? আপনিও আমাকে কুরআনের তাফসীর পড়তে নিষেধ করেন? আমি তো আপনাদের আচরণে বিভ্রান্ত হচ্ছি আব্বা। আপনি শুনলেন তো আপনার পীর ভাইয়েরা কেউ মাওলানা মওদূদীর কোনো তাফসীর কিংবা বই পুস্তক পড়েনি। তারা অন্যের মুখে শুনে শুনেই মাওলানা মওদূদীর বিরোধিতা করছে। কারো সাথে শত্রুতা করতে হলে তার সম্পর্কে জানা উচিত, কিছু না জেনে অন্যের মুখ থেকে শুনে কেন তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করবো?

আব্বা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে পড় তারপর তুমি বুঝে শুনেই সিদ্ধান্ত নিও।

পরের দিন সরোয়ার মামা তার কয়েকজন পীর ভাইকে নিয়ে আবার আসলেন কয়েকটা বই নিয়ে। একটি বড় বই। মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরীর ভুল সংশোধন। আর কয়েকটা ছোট ছোট পুস্তিকা। সবগুলোর নাম ও লেখকের নাম ভুলে গেছি। একটির কথা মনে আছে। জনৈক মাওলানা হাবিবুর রহমানের লেখা মিঃ মওদূদীর নতুন ইসলাম। বইটির নাম দেখেই লেখকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা হারিয়ে গেল, তাকে জঘন্য রুচিহীন এক লোক বলে মনে হলো আমার।

www.amarboi.org

বইগুলো আমাকে পড়তে দিয়ে তারা চলে গেলেন। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে বইগুলো পড়লাম। 'ভুল সংশোধন' বইটি পড়ে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তাও দূর হয়ে গেল। এই বইটির মাধ্যমে আমি অনেকগুলো বইয়ের নাম জানলাম। সে বইগুলোতে তাদের মতে মাওলানা মওদূদী ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। আমি সেই সব বইপত্র জোগাড় করলাম। তারপর সেগুলো পড়লাম। মাওলানা মওদূদীর ওপর আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিশেষভাবে 'খেলাফত ও মুলকিয়াত' এবং 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা' বই দু'টি পড়ে আমি যে কি পরিমাণ মুগ্ধ এবং লাভবান হলাম তা কাউকে বুঝাতে পারবো না।

ইসলামী সাহিত্য বলতে প্রথমে পড়ি একজন পীর সাহেবের লেখা ২৭টি পুস্তিকা। ভালো লাগলো এর পরে আশরাফ আলী থানভি র.-এর লেখা বই পড়ে মনে হলো এর চেয়ে সাহিত্য বুঝি আর নেই। এরপর ইমাম গাজ্জালী র.-এর 'কিমিয়ায়ে সাদত এহিয়ায়ে উলুমুদদ্বীন, দকায়েকুল আখবার' যখন পড়লাম মনে হলো কি অপূর্ব গ্রন্থ। কিন্তু মাওলানা মওদূদী র.-এর বই পড়ে আমি যে ইসলাম বুঝলাম, ইবাদাত বুঝলাম, ইলাহ বুঝলাম, রব বুঝলাম, কালেমা তাইয়েবার মর্মকথা বুঝলাম এসব কথা কিন্তু অন্য কোনো বই পুস্তক পড়ে আমি বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে পীর সাহেব মাওলানা ফজলুল করীম যশোর সফরে আসলেন। মেয়েদের উদ্দেশ্যে বয়ান করার জন্য তাকে আনা হলো সরোয়ার মামার বাসায়। তিনি বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন, প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। কলব পরিষ্কার করার জিনিস হলো, লাইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির। বেশি করে লাইলাহা ইল্লাল্লাহর বাড়ি মারবা কলবের ওপর, কলব আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে। জিকির ছাড়া ফিকির নাই বাবারে, জিকির ছাড়া ফিকির নাই। দমে দমে জিকির করবা একটা নিঃশ্বাস জিকির ছাড়া যেনো বৃথা যায় না।

তিনি আগেও এই বক্তৃতা করেছেন। তখন আবেগে ঝরঝর করে কেঁদেছি। আজ কান্না এলো না। বরঞ্চ কথাটি রসূল স.-এর শিক্ষার সাথে মেলে না বলে মনে হলো।

কয়েকদিন আগেই হাদীসে পড়লাম রসূল স. বলেছেন ঃ এক একটা পাপ কাজ করলে কলবের ওপর এক একটা দাগ পড়ে যায়। এভাবে পাপ কাজ করতে করতে কারো কারো কলব পুরোপুরিই কালো হয়ে যায়। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ স. তা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই? রসূল স. বললেন, হ্যাঁ আছে। তোমরা অধিক পরিমাণে কুরআন পড়বে আর মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।

আমি মাহফিল শেষ করে বাড়ি এসে আব্বাকে বললাম, আব্বা চরমোনায়ের পীর সাহেব হুজুর বললেন, কলব পাকসাফ করতে হলে কলবের উপর লাইলাহার বাড়ি মারতে হবে। আর রসূল স. বলেছেন, বেশি করে কুরআন পড়তে আর মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে। আমি কোনটা মানবো? আব্বা আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, রসূল স.-এর কথা মানবে।

www.amarboi.org

আমি বললাম, পীর সাহেব এই হাদীস জানেন না? তিনি কেনো হাদীসের বিপরীতে কথা বললেন?

ইতিমধ্যে সরোয়ার মামা এসে পর্দার ওপার থেকে সালাম দিলেন। আব্বাকে যে প্রশ্ন করেছি সরোয়ার মামাকেও সেই প্রশ্ন করলাম। মামা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি পীর সাহেবের ভুল ধরছো? তুমি নিজেকে কতো বড় আলেম মনে করো? মাওলানা মওদূদীর বই পড়ার তাছির দেখেছ! যে তুমি স্বয়ং পীর সাহেবের ভুল ধরে ফেললে। তুমি কি জানো? অনেক বড় বড় আলেম আছেন যারা পীর সাহেবের মুরীদ। তাদের মধ্যে পীর সাহেব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন এলো না আর তুমি.....। রাগে দুঃখে মামা তার কথা শেষ করতে পারলেন না। চলেই গেলেন। আব্বা মুচকি হেসে বললেন, তুমি সরোয়ারকে ওসব কথা বলতে গেলে কেন? রাগ করে চলেই গেল।

বললাম, আমি তো তাকে রাগানোর জন্য কথাটা বলিনি। আমি সঠিক কথা জানতে চেয়েছি। এরা তো দেখি রসূল স.-এর ওপরে পীর সাহেবকে মর্যাদা দেয়, আমি তো তা পারবো না আব্বা। এভাবে চরমোনায়ের পীর সাহেব এবং তাদের মুরীদরা যত বিরোধিতা করতে লাগলো আমার মধ্যে তত প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহটা বাড়তে লাগলো। একে একে পড়ে ফেললাম মাওলানা মওদূদী র. প্রায় সব বই।

আব্বা একটু চুপ করে থেকে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, মা জননী তোকে কি যে বলি। পীর সাহেবের প্রতি মনটা আমারও ভালো নেই। কিছুদিন আগে চরমোনায়ের বার্ষিক মাহফিলে গেলাম। সেখানকার ছোট্ট একটা ঘটনার কথা মনে হলেই পীর সাহেবের প্রতি মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। আমি আব্বার পাশে বসে হাত ধরে বললাম, কি ঘটনা আমাকে বলা যায় না?

বলা কেন যাবে না? বলে পশ্চিম দিকে হাত ইশারা করে বললেন, ঐ যে কাজী সাহেবকে চেন?

ঃ হ্যাঁ, চিনি। কিছুদিন আগে আর একটা বিয়ে করলো তো? বাসের ড্রাইভার। চতুর্থ সবকের মুরীদ। সে নাকি কবরের আজাব দেখতে পায়। কার গর্ভে কি সন্তান আছে তাও দেখতে পায়।

ঃ এসব বিশ্বাসযোগ্য কথা আব্বা?

ঃ তারপর শোন ঐ কাজী সাহেব আমাকে বলেছে তার কলব জারী হয়ে গেছে। আমাকে দেখিয়েছে জিকির করার সময় তার বাম পার্শ্বের একটা জায়গা যেখানে কলব আছে বলে আমরা বলি বেশ জোরে জোরে কেঁপে কেঁপে ওঠে। তো সেদিন পীর সাহেবকে একান্ত কাছে পেয়ে বলছে, হুজুর জিকির করা লাগে না। একটা কৌশল করে এমনিই আমি ঐ জায়গাটা কাঁপাতে পারি। বলে হাসতে হাসতে হুজুরকে দেখাল আর বলতে লাগলো এই হালত দেখিয়ে আমি অনেক মানুষকে আপনার মুরীদ করেছি। ঐ যে মোল্লা সাহেব ওতো পীর মুরীদি একদম পছন্দ করতো না ওকেও আমি এভাবে মুরীদ করেছি। আমি ওদের কাছেই বুকস্টলে দাঁড়িয়ে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলাম তাঁরা

www.amarboi.org

মনে করেছে আমি কিছু শুনতে পাইনি। ভাবলাম পীর সাহেব নিশ্চয়ই ওকে বকাঝকা করবে কিংবা কাজটা যে মিথ্যা এবং প্রতারণার মধ্যে পড়ে তা অন্তত বুঝাবে। কিন্তু না পীর সাহেব তো ওকে কিছু বললেন না বরং মুচকি হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে চলে গেলেন। তখন মনটা আমার কি যে খারাপ হয়ে গেল। পীর সাহেবের প্রতি আর ভক্তি শ্রদ্ধা ধরে রাখতে পারলাম না।

ঃ আব্বা, আপনি নাকি গতকাল পীর সাহেবের জিকিরের মাহফিল থেকে উঠে এসেছেন? মিজান বললো। কেন চলে এসেছেন আব্বা?

আব্বা বললেন, রাগ করেই চলে এসেছি। একজন হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর ছাত্রশিবির সম্পর্কে কিছু বলেন। হুজুর বললেন– বেয়াদব, বেলেহাজ আর বেতমিজ এই তিনগুণ যার মধ্যে আছে সেই শিবির। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, তাহলে হুজুর ছাত্রলীগ সম্পর্কে কিছু বলেন। হুজুর রাগ করে বললেন, যান জিকিরে বসেন। খালি বেশি বেশি কথা। খামাখা বসে থাকতে আর ভালো লাগলো না। চলে এসেছি।

শিবিরের ছাত্রদের সম্পর্কে মন্তব্য করলেন– বেআদব, বেতমিজ বলে আর ছাত্রগীগ বা অন্যান্য দল, যারা সব সময় ইসলামের বিরোধিতা করে নামায তো দূকে থাক প্রস্রাব করে পানি পর্যন্ত নেয় না। তাদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই নেই তার। ছাত্র শিবিরের ছেলেদের দেখলে আমার সাহাবীদের জামানার কথা মনে পড়ে। কলেজ ভার্সিটিতে পড়ে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে না। কুরআন-হাদীসের ওপর কি চমৎকার জ্ঞান রাখে। আমার মিজানের পরিবর্তনটাই একটু লক্ষ্য করো। থামলেন আব্বা।

মিজান আমার ছোট ভাই। বর্তমানে শিবিরের সাথী। রাজশাহী ভার্সিটিতে পড়ে। নামায পড়তো ছোটবেলা থেকেই রমযানের রোযাও রাখতো। কিন্তু একটা সিনেমাও বাদ দিত না। ওর কাছেই শুনেছি রোযার মাসে মাগরিবের নামাযের পর নাকি ইফতার করার বিরতি দেয় সিনেমা হলে। ইফতার আর মাগরিবের তিন রাকাত নামায পড়েই আবার সিনেমা হলে ঢুকে যেতো। আমাদের বাড়িটা মনিহার সিনেমা হলের কাছেই। বাংলাদেশের দূর-দূরান্তের লোকেরা এই হলে এসে সিনেমা দেখে। যদিও আমাদের বাড়ির কোনো মেয়ে কোনো দিনই এই হলে ঢোকেনি। কারণ হলো উদ্বোধনের আগেই আমরা সবাই চরমোনায়ের মুরীদ হয়ে গিয়েছিলাম। মিজান বলতো, মুরীদ হওয়া দূরে থাকুক পীর সাহেবকে গুলিয়ে খাইয়ে দিলেও আমি সিনেমা দেখা ছাড়তে পারবো না। ও একটা খাতা তৈরি করেছিল। তাতে ও হিসেব রাখতো মনিহার সিনেমা হল উদ্বোধনের পর থেকেই যতো সিনেমা দেখানো হয়েছে তার নাম, পরিচালকের নাম, নায়ক-নায়িকার নাম আর ওর দেখার তারিখ। এই খাতা নাকি সে ওর নাতী-নাতনীদের দেখাবে।

সেই মিজান প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল সিনেমার ধারে কাছে যায় না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়ে। আব্বা নাকি ওকে একদিন দোয়া কুনুত পড়তে বলেছিলেন। মিজান পারেনি। সেই মিজান এখন নামাযে যা পড়ে সব কিছুর অর্থ পর্যন্ত জানে। মিজানের বয়স ১৮ বছর। আব্বা বললেন, আমি আঠারো বছরে মিজানকে যে শিক্ষা দিতে পারিনি শিবির

www.amarboi.org

এক বছরে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শিখিয়েছে। সেই শিবির সম্পর্কে খারাপ কোনো মন্তব্য যেই করুক, তার সাথে আমার কোনো খাতির নেই।

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চলে গেল একটা বছর। ভুল সংশোধন বইটি পড়ে আমি অনেকগুলো চমৎকার বইয়ের নাম জানলাম। সে বইগুলো শিবিরের অফিস, ছাত্রী সংস্থার পাঠাগার, বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে যোগাড় করলাম। তাই সাংগঠনিকভাবে কর্মী হওয়ার আগেই আমার রুকন সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল।

ইতোমধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের লেখা 'ইকামাতে দ্বীন' বইটি আমি হাতে পেলাম। অপূর্ব! অসম্ভব ভালো লাগলো বইটি পড়ে। ইকামাতে দীন সম্পর্কে নতুন একটা ধারণা পেলাম। ইকামাতে দীন ও খেদমতে দীনের বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম পীর সাহেবেরা যে কাজটা করছে তা হলো খেদমতে দীনের কাজ।

১৯৮৫ সাল। আমি তখন তিন ছেলের মা। বড় ছেলের বয়স পাঁচ বছর। ওকে জামায়াত পরিচালিত স্কুল বাদশা ফয়সাল ইসলামিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি করলাম। স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষকদের ব্যবহার, শিক্ষা দান পদ্ধতি বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক জামায়াতে ইসলামীর রুকন জনাব শহীদুল্লাহ সাহেবের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে।

এর আগে কোনো জামায়াতে ইসলামীর রুকনের সাথে আমার দেখা সাক্ষাত হয়নি, তাই জনাব শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা বলার ধরনটা আমার খুবই পছন্দ হলো। সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে বিষয়টা, তা হলো তিনি কখনো মুখের দিকে তাকান না, দৃষ্টি নত করে কথা বলেন। যার জন্যে তাঁর সাথে কথা বললে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করা যায়। বিব্রত কিংবা সংকুচিত হতে হয় না।

শহীদুল্লাহ ভাই একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জামায়াত করেন?

বললাম, না জামায়াত করি না, আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

ভাই বললেন, না আপনার হাতে মাওলানা মওদূদী র.-এর বই দেখছি তো তাই।

বললাম, মাওলানা মওদূদীর বই আমার খুব ভালো লাগে।

উল্লেখ্য ছেলেকে ভর্তি করার কারণে আমাকে প্রায়ই বাদশা ফয়সাল স্কুলে যেতে হতো।

আমার বাসায় তখন নিয়মিত ছাত্রী সংস্থার বৈঠক হতো। মাঝে মাঝে আইনুন্নাহার আঞ্জু আপাও আসতেন। আঞ্জু আপা আসলে আমার ভীষণ ভালো লাগতো। আমি মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনতাম। আঞ্জু আপা একদিন আমাকে বললেন, আপা, আপনি নাকি খুব ভালো গান গাইতে পারেন। আজকে আমরা আপনার গান শুনবো। নজরুল ইসলামের কয়েকটা ইসলামী গান ওদেরকে শুনালাম। খুব খুশি হলো আঞ্জু আপা আর অন্যান্য মেয়েরা। ওদের দাবী ওরা গান শিখবে। সপ্তাহে একদিন আমার বাসায় ওরা আসবে গান শিখতে। আমি সানন্দে রাজী হলাম ওদের প্রস্তাবে। মনে মনে খুবই খুশি হলাম, এতো দিনে আমার গান শেখাটা যেনো সার্থকতা পেল। সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর কয়েকটা ক্যাসেট দিয়ে গেল ওরা আমাকে। কি যে অপূর্ব সে গান। সারা দিন-রাত সেই সব গান শুনতাম।

www.amarboi.org

গান শুনে চোখে পানি এসে যেতো। আল্লাহ প্রেমে, রসূল প্রেমে হৃদয়টা ভরে উঠতো। তখনই আমার পাঁচ বছরের ছেলে তাহিরের সব গান কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। ওকে গান গাইতে বললে একটার পর একটা গেয়ে যেতো।

ইতিমধ্যে মিজানকে ফুলকুঁড়ির দায়িত্ব দেয়া হলো। মিজান ছোট ছোট এক গাদা পিচ্চি বাচ্চা নিয়ে আসতো আমার বাসায়। গান শেখানো, বক্তৃতা শেখানোর জন্য। বাড়িটা যেনো সার্বক্ষণিক একটা আনন্দ মেলার মতো হয়ে গেল।

আব্বার পীর ভাইদের তৎপরতায় যেনো ভাটা পড়ে গেল। তারা হয়তো মনে মনে বলতে লাগলো মেয়েটা গোল্লায় গেল। সরোয়ার মামা মাঝে মাঝে আসতেন, উপদেশ দিতেন, জামায়াতে ইসলামীর সাথে যেনো হাত না মিলাই। আমি বললাম, মামা আমি যতদূর জানতে পেরেছি যশোর জেলায় জামায়াতে ইসলামীর কোনো মহিলা শাখা নেই। অতএব জামায়াতে ইসলামী করার তো প্রশ্নই আসছে না। ইসলামী ছাত্রী সংস্থার মেয়েরা আমার কাছে আসে, আমিও ওদের বৈঠকাদিতে যাই। ওরা খুবই ধার্মিক আর প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তাছাড়া ওরা খুবই ভালো। কেন ওদের বিরোধিতা করবো বলেন। মামা, আমি পীর সাহেবের মুরীদ হয়েছি, উম্মত তো হইনি। পীর সাহেবের যে কথাটা কুরআন-হাদীসের মধ্যে আছে তাই মানবো আর যে কথাটা কুরআন-হাদীসের বিপরীতে পাবো তা মানবো না। আমি কারো অন্ধ ভক্ত হতে পারবো না মামা।

ঃ দেখ তুমি যা ভালো বোঝ। বলে মনোক্ষুণ্ন হয়েই মামা চলে গেলেন।

১৯৮৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। ইসলামী ছাত্রী সংস্থার এক সুধী সমাবেশ। যশোরের বিখ্যাত ধনী ব্যক্তিত্ব আকিজ মিয়ার বাড়ি। এখানেই ওদের বড় বড় অনুষ্ঠানগুলো হয়। আঠারো উনিশ জন মহিলা তাদের কাউকেই আমি চিনি না। ছাত্রীও অনেক, তাদের অনেককেই অবশ্য চিনি। আমার তিন পুত্রকে নিয়েই হাজির হয়েছি। আমার ছেলেদের বয়স তখন যথাক্রমে ছয় বছর, তিন বছর, এক বছর। আমার ছোট দুই ছেলেকে মেয়েরা আদর করে কোলে তুলে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলনে। আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম, ওরা আমাকে বেশ বিরক্ত করছিল– বাসায় যাবে বলে। প্রোগ্রাম শুরু হলো। কুরআন তেলাওয়াত, উদ্বোধনী বক্তব্য, হামদ নাত, বিভিন্ন বক্তৃতা। তার মধ্যে আমারও দুটো গান পরিবেশন করার সুযোগ হয়েছিল। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে এমন সময় অনুষ্ঠানের ঘোষিকা ঘোষণা করলেন, এবার সুধীদের তরফ থেকে কিছু বলার জন্য আহবান করছি। সুধীদের পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলুন। আঠারো/উনিশ জন সুধী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে মাথা নিচু করে বসে ছিল। কেউ কিছু বলার জন্য এগিয়ে এলো না। এবার আঞ্জু আপা হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রুমী আপা আপনি কিছু বলুন। কি আর করা উঠে দাঁড়ালাম। আমি কি বলেছিলাম সব কথা আজ মনে নেই। যতদূর মনে আছে বলেছিলাম, ছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে এসে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যেখানে আমাদের দেশে চলছে বেপর্দার সয়লাব অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা সেখানে আল্লাহর নূর হাতে এই ফেরেশতাতুল্য মেয়ে কটিকে দেখলে আমার মনে হয় চৌদ্দশ বছর পূর্বের

www.amarboi.org

সেই সোনালী যুগে আছি। আয়েশা রা., ফাতেমা রা. আমাদের সাথে আছে। আমাদের যাদের মেয়ে আছে, ছোট বোন আছে তাদেরকে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর একটা কথা এই যে স্কুল কলেজের ছোট মেয়েরা দীনের যে দায়িত্ব পালন করছে, আমরা বড়রা কেন সে ব্যাপারে নির্বিকার আছি? সংগঠিত হওয়া রসূল স.-এর নির্দেশ। আমরা কেন সেই নির্দেশ পালন করছি না?

আঞ্জু আপা আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি আস্তে আস্তে বললেন 'রুমী আপা আপনি আহবান করেন। আপনি বলেন আসুন আমরা সংগঠিত হই।'

আমি কিছু না বুঝে আঞ্জু আপার কথাটাই সম্মোহিত মানুষের মতো বলে ফেললাম। উপস্থিত সুধী মা বোনেরা আসুন আমরা সংগঠিত হই। আমার কথা শেষ হতেই আঞ্জু আপা কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, সংগঠন থেকে দূরে থাকার পরিণতি খুব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করলেন।

পর্দার ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠের আওয়াজ এলো। আঞ্জু, তাহলে এখনই সবার ফরম পূরণ করে ফেলো। আমি অবাক হয়ে বললাম ও ঘরে কে? তিনি কখন এসেছেন? আঞ্জু আপা হাসি মুখে বললেন, মিনিট দশেক আগে। এখন বুঝলাম কিছুক্ষণ আগেই আঞ্জু আপার ছোট বোন সাইফুননাহার তাঁর কানে কানে কি যেনো বলছিল। আঞ্জু আপা শুধু বললেন। বসতে দাও। আমি আবার বললাম, কে তিনি? আঞ্জু আপা বললেন জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলা সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন চাচা। ততক্ষণে আঞ্জু আপা জেলা সেক্রেটারীর কাছ থেকে প্রাথমিক সদস্য ফরম নিয়ে অন্যান্য মহিলাদের ফরম পূরণ করাচ্ছে। সবাই বিনা বাক্য ব্যয়ে ফরম পূরণ করলো। সব শেষে আমার কাছে নিয়ে এলো ফরমটি। কি করবো বুঝতে পারছি না। সরোয়ার মামা ও তার অন্যান্য পীর ভাইদের কথা মনে পড়লো। মনে মনে একটু ভয়ই পেলাম, তারপর শিবচর থেকে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তাও মনে পড়লো। একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। বললাম, ফরম পূরণ আজ না করলে হয় না?

আঞ্জু আপা বললেন, আপনার আহবানেই তো সবাই ফরম পূরণ করলেন আর আপনি না করলে কেমন হয়? কথাতো ঠিকই কিন্তু আমার আব্বা.....! আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে আঞ্জু আপা বললেন, আপনার আব্বাকে আমি চিনি। তিনি কিছুই বলবেন না।

ফরম পূরণ করলাম। খুশিতে সবাই আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন। ওপাশ থেকে জেলা সেক্রেটারী বললেন, এবার এই উনিশ জনের মধ্যে থেকে একজনকে পরিচালিকা নিযুক্ত করে ফেলুন। আঞ্জু আপা দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সবার পক্ষ থেকে মাসুদা সুলতানা রুমী আপাকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যশোর জেলার মহিলা শাখার পরিচালিকা হিসেবে ঘোষণা করছি।

আমি তখন যেনো একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে আঞ্জুকে বললাম, আঞ্জু আপা একি করলেন? আঞ্জু আপা আমার হাত ধরে গভীর আবেগের সাথে বললেন, রুমী আপা আমরা যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি, আপনি যদি ভালো মনে করেন দীনের এ মহান দায়িত্ব আপনি পালন করবেন। নইলে না।

www.amarboi.org

চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আঞ্জু আপা মোনাজাত করলেন। মোনাজাতের পরে আমার সব দ্বিধা সংকোচ যেনো দূর হয়ে গেল। জেলা সেক্রেটারী আঞ্জু আপার হাতে কয়েকটা বই দিয়ে গেলেন আমাকে দেয়ার জন্য। এতো বই পড়েছি কিন্তু এ বইগুলো কখনো পড়িনি। তা হলো জামায়াতে ইসলামীর পরিচিতি, জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, কার্যবিবরণী, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলী ইত্যাদি। গভীর মনোযোগের সাথে বইগুলো পড়লাম। তারপর জামায়াতে ইসলামীর প্রতি মনটা শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো।

দুই তিন দিন পরে একদিন মিজান এসে বললো, আপা বাদশা ভাই আপনার সাথে কথা বলবেন।

ঃ বাদশা ভাই কে? জানতে চাইলাম আমি।

মিজান বললো ও বাদশা ভাইকে আপনি চেনেন না? নূরুল ইসলাম বাদশা, শহর আমীর।

বাদশা ভাই আমাকে একটা রিপোর্ট বই দিলেন আর আগামীকাল বিকেল তিনটায় তার বাসায় যেতে বললেন।

রিপোর্ট বইটা কি যে ভালো লাগলো। এসব তো আমি কিছুই জানতাম না। আমার আর একটি নতুন জীবন শুরু হলো।

পরদিন তিনটার সময় বাদশা ভাইয়ের বাসায় গেলাম। বাদশা ভাইয়ের স্ত্রী খুব সম্মানের সাথে আমাকে বসতে দিলেন। দেখেই চিনলাম ছাত্রী সংস্থার সুধী সম্মেলনে দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে আরো কয়েকজন এলেন, এদের সবাইকে সেদিন দেখেছি সুধী সম্মেলনে। আমরা সবাই এক রুমে বসলাম আর বাদশা ভাই পর্দার ওপাশে অন্য ঘরে বসে আছেন। বললেন, একটা বইয়ের পাঠচক্র করবো আমরা। পাঠচক্র কাকে বলে বুঝিয়ে দিলেন। সামষ্টিক পাঠ এবং পাঠচক্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝালেন।

সত্যের সাক্ষ্য বইটা সবাইকে পড়তে দিলেন। এই অতীব চমৎকার ছোট বইটি আগেই আমি পড়েছি। বাদশা ভাই বইটি নোট করতে বললেন। এক সপ্তাহ পরে নোট নিয়ে সবাইকে আবার আসতে বলে ছোট করে মোনাজাত করলেন। এর আগে অনেক বৈঠক আমি করেছি। তাবলীগ জামাতের, পীর সাহেবের কিন্তু এমন চমৎকার ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন শিক্ষামূলক বৈঠক আমি কখনও করিনি। মনে হলো কোনো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস করে এলাম। মনটা কেমন যেনো ফুরফুরে হয়ে গেল।

এভাবে যতো দিন পার হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর কর্মকাণ্ডে আমার মন এই সংগঠনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গেছে। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে মনে হলো আমি আমার সঠিক মনজিলে পৌঁছে গেছি। নিজেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কর্মী বলে পরিচয় দিতে কেমন যেনো গর্ববোধ করছি। পরের সপ্তাহে বাদশা ভাই জানালেন হাফেজা আসমা খাতুন আসবেন আগামী বৃহস্পতিবার। বললাম হাফেজা আসমা খাতুন কে? বাদশা ভাই বললেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি এলেন। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকার মতো এক ব্যক্তিত্ব। আমার হাত ধরে বললেন, তুমি মাসুদা সুলতানা রুমী? জী। তোমার কথা আমি আঞ্জুর মুখে শুনেছি।

www.amarboi.org

যশোরে আমাদের বগীর অভাব নেই অভাব ছিল একটা ইঞ্জিনের। সেই ইঞ্জিন মহান আল্লাহ হয়তো এবার আমাদের দিলেন। এবার কাজ চলবে ইনশাল্লাহ। বলে হাফেজা আসমা খাতুন আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগের সাথে বললেন, 'বুকের সাথে বুক মিলিয়ে নাকি এলেম দেয়া যায়।' আমি জানি না। যদি সত্যি এমন পদ্ধতি মহান আল্লাহর থাকে, তাহলে আমার যা কিছু এলেম কালাম আছে তা তোমার মধ্যে যেনো যায়।

এ কেমন ভালোবাসা আর এ কেমন অযাচিত সম্মান। আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। নিজেকে বড় সৌভাগ্যবতী মনে হলো। আমার আব্বা আমার নাম রেখেছেন মাসুদা সুলতানা। সৌভাগ্যবতী রাণী। আমার নামটা যেনো সার্থকতা খুঁজে পেল। আসমা খালাম্মার সেদিনকার আন্তরিক ব্যবহারের কথা মনে হলে আজও আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। মহান আল্লাহ যেনো আমার আসমা খালাম্মাকে উত্তম জাযাহ্ দান করেন।

সেদিনই আমি আসমা খালাম্মার কাছে দারসের নিয়ম শিখি। তিনি সুন্দর করে বললেন, আমি আর অন্যান্য কর্মী বোনেরা তা খাতায় লিখে নিলাম। তার কথাগুলো আমি শুধু খাতার পাতাতেই লিখিনি মনের পাতাতেও লিখেছিলাম। তাই তো কোনো দিন আর তা ভুলিনি। আসমা খালাম্মা চলে যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিলেন, অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে তুমি এই কাফেলায় শামিল হয়েছো। তোমাকে পরিচালিকা করেই যশোরে মহিলা জামায়াতের কাজ শুরু হলো। ইবলিস জান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে। তুমি অবিচল থেকো।

খালাম্মা চলে গেলেন কিন্তু খালাম্মার উপদেশটি আমার মন এবং মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি অবিচল আছি এবং থাকবো ইনশাল্লাহ জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

শয়তান যে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেনি তা কিন্তু নয়। সে তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছে। আর আমার মালিক আমাকে রক্ষা করেছেন তার খাস রহমতে।

১৯৮৭ সাল। যশোর শহরে ১৭টা ইউনিটে কাজ চলছে। বড় ছেলের বয়স সাত বছর। ছোট দু'জন যথাক্রমে চার এবং দু'বছর। ছোট দু'জনকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই। মাঝে মাঝে বাসায় রেখেও যাই। তাতে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়। কি আর করা এভাবেই চলছিল দিন। নিজের ব্যক্তিগত পড়াশুনা, রিপোর্ট রাখা ইত্যাদি কাজ অথচ দিনে একটুও সময় পাই না। বড় ছেলেটা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাকে একটু পড়াতে হয় তারপর বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া করিয়ে ঘুম পাড়াতে প্রায় সাড়ে নয়টা/দশটা বেজে যায়। এরপর নিরিবিলি একটু সময় পাওয়া যায় কুরআন-হাদীস ইসলামী সাহিত্য পড়ার। কিন্তু তখন ছেলেদের বাবার নির্দেশ লাইট অফ করে শুয়ে পড়ো, অথচ তখনো আমার কোনো পড়াশুনা হয়নি, মনের মধ্যে অশান্তি নিয়ে শুয়ে পড়েছি। প্রায় ২৫/৩০ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থেকে যখন দেখেছি সবাই ঘুমিয়ে গেছে আমি তখন চুপিচুপি বিছানা থেকে নেমেছি। রান্না ঘরের লাইট জ্বালিয়ে আমার ব্যক্তিগত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি, রিপোর্ট রেখেছি : এভাবেই দ্বন্দ্বে-ছন্দে চলছিল দিন।

www.amarboi.org

ইতিমধ্যে ইবলিস এমন একটা দিক দিয়ে আমার ওপর হামলা চালালো যে দিক সম্পর্কে আমি মোটেও সতর্ক ছিলাম না।

১৯৮৭ সালের খুব সম্ভব মার্চ/এপ্রিল মাস। দেশব্যাপী জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের উদ্যোগে দাওয়াতী পক্ষ চলছিল। আমি মনে মনে সিদ্ধান্তই নিয়েছি এমনভাবে দাওয়াত দেবো যাতে আমার মহল্লার কোনো মহিলা যেনো বলতে না পারে যে, আমি দাওয়াত পাইনি।

এক বাড়িতে দাওয়াত দিতে গিয়ে ভীষণভাবে হোঁচট খেলাম। সেই বাড়ির খালাম্মা বেশ তিরস্কার আর বিদ্রূপের সুরে আমার সাথে কথা বললেন। কিন্তু তাতে আমি দমে গেলাম না। ভাবলাম দাওয়াতী কাজ আরো বেশি বেশি করতে হবে, সবাইকে ভালো করে বুঝাতে হবে। তাদের মধ্যে সঠিক বুঝ এলে তখন আর তারা বিরোধিতা করবে না, বরং সহযোগিতা করবে।

এই চিন্তা করে আমার কাজের গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। আমার কাজের গতি বেড়ে যাওয়াতে আমার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই বাধা দিতে লাগলেন। কারণ আমার ছেলেরা ছোট ছোট এবং ইতিমধ্যেই চারজন। আমাকে অনেকেই বলতো, 'ঘর সংসারের ব্যাপারে তুমি উদাসীন হয়ে পড়েছ। এভাবে বাইরে কাজ করলে সওয়াব পাবে না।' এসব কথায় মাঝে মাঝে আমি ভয় পেয়ে যেতাম। কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হতো আমি তো সংসার স্বামী সন্তান সবার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেই সংগঠনের কাজ করছি। এরপর যেটুকু বাদ থাকছে সেটুকুর তো বিকল্প আছে, কাজের বুয়াই তা করতে পারে। কিন্তু আমার সাংগঠনিক কাজের তো কোনো বিকল্প নেই। একদিন ভীষণ কষ্ট পেলাম আমার ছোট ভাই মিজানের কথায়। সে বললো আপা আমার মনে হয় আপনার ছেলেদের অভিশাপ লাগবে আপনার। আমি তিনটার সময় ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে প্রোগামে যাই, সেদিন নাকি আমার মেঝ ছেলে ঘুম থেকে উঠে 'আম্মু যাবো, আম্মু যাবো বলে খুব কান্নাকাটি করেছে। আমাকে সাংগঠনিক কাজের জন্য আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবার কাছ থেকেই কিছু না কিছু কথা শুনতে হয়। কিন্তু মিজান শিবিরের সাথী হয়ে যখন এই কথা বললো আমি তখন সত্যিই খুব কষ্ট পেলাম। তাকে বললাম, আমার ছেলে যখন কান্নাকাটি করছিল তখন তুই বাসায় ছিলি না? শোন, আমি সাংগঠনিক কাজে বাইরে গেলে তুই বাসায় থাকা সত্ত্বেও যদি আমার ছেলেরা কাঁদে আর ওদের কষ্ট হয়, তাহলে শুধু ছেলেদের নয় আমারও অভিশাপ তোর ওপরে পড়বে। এরপর আব্বা নিজেই খুব খেয়াল রাখতেন আমার ছেলেদের ওপর। আমি যখন বাইরে প্রোগ্রামে যেতাম আব্বা আমার ছেলেদের খুব আদর করে আগলে রাখতেন। ইতিমধ্যে আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোনো এক প্রোগ্রামে গিয়েছি। সেখানে তিনজন বয়স্কা মহিলা আমার সাথে কথা বলছে। তাদের দেখতে সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবা মহিলাদের মতো মনে হচ্ছে। আমাকে তারা বলছে, 'এই যে তুমি ঘর সংসারের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন না করে জামায়াতের কাজ করো, এটা তোমার করা ঠিক নয়।'

www.amarboi.org

আমি বললাম, 'জামায়াতের কাজ বলছেন কেন? এতো আমার নিজের কাজ। আমি তো ইকামতে দীনের কাজ করছি! তখন তারা তিনজন এক সাথে বলতে লাগলো, না, না এ সব কাজ ঠিক নয়।' আমি তখন কেমন যেনো ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম এদের কথার ঠিক মতো জবাব দিতে পারছিলাম না। তারপরও বললাম, আপনারা কি এই আয়াত পড়েননি 'ওয়াতাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু'– তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'

মহিলারা বললো, 'হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু রজ্জু কোথায়? সে রজ্জু তো তোমাদের কাছে নেই।'

হঠাৎ আমি দেখলাম আকাশ থেকে একটা সাদা ঝকঝকে নাইলনের রজ্জুর মতো ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে। এক মাথা আকাশে লাগানো আছে আর এক মাথা আমার সামনে এসে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি দড়িটা দুহাত দিয়ে গোছাতে গোছাতে বললাম, রজ্জুটা কার হাতে? আমি দেখলাম, তিনজন মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। পরাজিতার সুরে তারা বললো, 'হ্যাঁ রজ্জু তোমার হাতেই।'

আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো তখনো বুঝি সবেমাত্র আকাশ থেকে নেমে আসা রজ্জুটা ধরেই আছি। ফজরের আযান হচ্ছে তখন।

মুরুব্বীদের বিভিন্ন ধরনের কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার মধ্যেও এক ধরনের দুর্বলতা আসতো। ভাবতাম কি জানি ভুলই করছি কি না। এই স্বপ্নটা দেখার পর থেকে কি যে এক অনাবিল শান্তিতে আমার মন ভরে গেল। তারপর মনে মনে সকল সিদ্ধান্তে দারুণ দৃঢ়তা পেলাম। আমার মনে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিল, হ্যাঁ, মনজিলে মাকসুদে পৌঁছার এই একটিই রাজপথ। এ পথের কোনো বিকল্প নেই। আমি একটু ভাবলেই দেখি আল্লাহ পাকের আরশ থেকে নেমে আসা রজ্জুটি আমার হাতে। ভাবলেই আমি অবাক হই, শিহরিত হই।

আমি সাংগঠনিক সিস্টেমে সংগঠনের সাথে জড়িত হইনি, আমার প্রভু, আমার মালিক, আমার রব রহমানুর রহিম আল্লাহ পাক নিজ রহমতে, যেনো নিজে হাতে ধরে আমাকে এই সংগ্রামী কাফেলার সাথে শামিল করে দিয়েছেন। সারা জীবন সিজদায় কাটিয়ে দিলেও যার শুকরিয়া আদায় করা যাবে না। আর আমার প্রাণের অনুভূতি প্রকাশের ভাষাও তো আমার নেই। তাই প্রিয়তম মহান রবের ভাষাতেই বলি, 'রব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূ বানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব।'

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের চোখের সামনে আলো-আঁধারের মতো মিথ্যা, অন্যায়, অসত্য ও বাতিল– সত্যের নামে জাল বিস্তার করে আছে। কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি হক আর কোনটি তা বাতিল বেছে বের করা ভীষণ কঠিন। স্বার্থ শিকারীরা তাদের স্বার্থের টোপ এমনি কূট কৌশলে লোভনীয় করে পেতে রেখেছে যে অজ্ঞ, মূর্খ লোক তাদের সুখ ভোগের উপকরণ যুগিয়ে দিতে সেদিকে দল বেঁধে যাচ্ছে। বিবেকের দিক থেকে এরা অন্ধ। এই অন্ধরা কখনো অনাবিল মন নিয়ে সত্য সন্ধান না করে সারাজীবন সত্যের নামে বাতিলের অন্ধকারে সাঁতার কেটে মরছে।

অনাবিল মন নিয়ে যারা সত্য সন্ধান করেন তারা এক সময় সে সত্যের সন্ধান পেয়ে যান। লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী ছোটবেলা থেকে অনাবিল মন নিয়ে সত্য সন্ধান করছিলেন এবং সঠিক ইসলাম বুঝে তা মেনে চলার বাসনা নিয়ে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই পুস্তক অধ্যয়নে রত ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চরমোনায়ের পীরের মুরীদ হয়েছিলেন। মনে করেছিলেন এটাই ইসলামের সঠিক তরিকা। তিনি পীরের কথাবার্তা, চাল-চলন ও কাজকর্ম কুরআন-হাদীসের আলোকে অবলোকন করেছিলেন। কিছুদিন দেখার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এ পীর কুরআন-হাদীসের নীতি আদর্শ অনুসরণ করছেন না বরং ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ইসলাম শুধু তার পোশাক মাত্র।

লেখিকা মাসুদা সুলতানা রুমী অন্যদিকে অন্যান্য ইসলামী সংগঠনসহ জামায়াতে ইসলামীর বই পুস্তক পড়ে তার নীতি আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতি ভালো করে প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। পরিশেষে তিনি কেমন করে সত্যের সন্ধান পেলেন, কেমন করে চরমোনায়ের পীরের তরিকা উপেক্ষা করে নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীসহ জামায়াতে ইসলামীতে সামিল হলেন, আলোচ্য পুস্তিকা তারই হৃদয়গ্রাহী আলোচনা।

লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মানসিকতা, পারিবারিক অবস্থা ও চারপাশের জন-মানুষের অবস্থা অত্যন্ত সরস ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। পুস্তিকাটিতে একটু চোখ বুলালেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন। সঠিকভাবে ইসলামী আন্দোলনকে জানতে হলে পুস্তাকাটি পাঠ করা প্রত্যেকের জন্য অতি আবশ্যক।